পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণে তারি

বঙ্গবীর

রণজিৎ রায়।

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

মূল্য—১।০ পাঁচ সিকা।



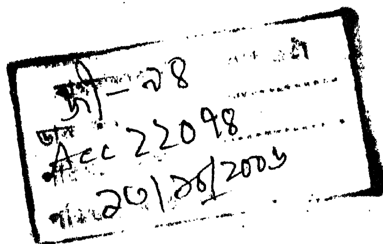
হাওড়া,

৪নং তেলকল ঘাট রোড, "কর্ম্মযোগ প্রেস

হইতে

শ্রীযুগলকিশোর সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।





উৎসর্গ পত্র।

পরোপকারনিরত, উদারহৃদয়,

দানবীর, বিদ্যোৎসাহী

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার দে

ধার্ম্মিকবরকরকমলেষু।

বৎস!

তুমি অতি শৈশবাবস্থায় পার্থিব মাতাপিতার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও, পরমপিতা পরমেশ্বর তোমাকে জগজ্জননী কমলার স্নেহময় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া অতিশয় যত্নের সহিত লালন-পালন করিয়াছেন। তাঁহারই অপার করুণাবলে তুমি দয়া, ধর্ম্ম, বিনয়াদি সদ্‌গুণ-সমূহে বিভূষিত হইয়া প্রকৃতমনুষ্যপদবাচ্য হইতে সমর্থ হইয়াছ এবং তোমার স্বনামধন্য, মহাকীর্ত্তিমান্ পিতা রায় চিন্তামণি দে বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র হইয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ। এত অল্পবয়সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও তুমি তোমার স্বভাবচরিত্র দোষসম্পর্কশূন্য রাখিতে সক্ষম হইয়াছ, তাহা পরম শ্লাঘ্য ও গৌরবের বিষয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

উৎসর্গ পত্র।

এই সকল মহৎ গুণে আকৃষ্ট হইয়া তোমার বাল্যাবস্থার শিক্ষক স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ "বঙ্গবীর রণজিৎ রায়" তোমারই করকমলে সমর্পণ করিল। গুণগ্রাহী তুমি, বঙ্গবীরের উপযুক্ত সমাদর করিতে নিশ্চয়ই ত্রুটি করিবে না।

হাওড়া। } শুভানুধ্যায়ী
শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য।

নিবেদন।

অনেকেই হয়ত মনে করিবেন "বঙ্গবীব রণজিৎ রায়" একখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কিন্তু ইহা একেবারেই কল্পনাপ্রসূত নহে। বণজিৎরায়েব অতি প্রকাণ্ড দীঘি অগাধ সলিলরাশি বক্ষে ধারণ কবিয়া এখনও অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রবাদ আছে ভগবতী এই দীঘির জল হইতে শঙ্খশোভিত হস্তদ্বয় উত্তোলন কবিযা রণজিৎকে দেখাইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণকথামৃত নামক পুস্তকে দৃষ্ট হয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব রাজা রণজিৎ সম্বন্ধীয় এই সকল কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া তাঁহার ভক্তগণকে বলিয়াছেন। রণজিৎ রায় যে দিন এই সরোবর জলে দেহত্যাগ কবেন, প্রতি বৎসর চৈত্রমাসের সেই বারুণীর দিন বহুদূবদেশ হইতে সহস্র সহস্র নরনারী এই দীঘিতে স্নান করিতে আগমন করে।

বায়ড়া জনপদের অন্তর্গত বিক্রমপুর গ্রামে রণজিতের প্রতিষ্ঠিত বিশালাক্ষিদেবীর মন্দির এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

যে-স্থানে রাজা রণজিতের গড়বেষ্টিত প্রাসাদ ছিল, সেই স্থান এখনও 'গড়বাড়ী' নামে প্রসিদ্ধ থাকিয়া অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। এতদ্ব্যতীত মাধবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী রায়ের নিকট কীটদষ্ট অতি জীর্ণ একখানি প্রাচীন পুঁথি প্রাপ্ত হই। তাহা হইতে রণজিতের জন্মবিবর

রাজ্যস্থাপন ও যুদ্ধাদি সম্বন্ধীয় অনেক কথা গ্রহণ করি। কখনও কখনও দেশপ্রচলিত প্রবাদবাক্যের উপরও নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছি। এইরূপ বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছি। "বঙ্গবীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী" লিখিবার সময় ভুবিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের তথ্যসংগ্রহকালে প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ মহোদয় আমাকে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য প্রাচীন রাজ্যের তথ্য সংগ্রহ করিতে উৎসাহিত করেন। সেই উৎসাহের ফলেই আজ বঙ্গবীর রণজিৎকে লোকলোচনের সম্মুখে আনয়ন করিতে কৃতকার্য্য হইলাম। বর্ষাকালে বায়ড়া অতি দুর্গম হইয়া উঠে বলিয়া ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ কোন স্থান বা মন্দিরের ফটো লইতে পারি নাই। সুতরাং প্রথম সংস্করণে বিশেষ প্রয়োজনীয় চিত্র সকল পুস্তকমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না। দ্বিতীয় সংস্করণে এই অভাব পূর্ণ করিবার আশা রহিল।

হাওড়া।
১৮৪২ শকাব্দাঃ।

গ্রন্থকার।

বঙ্গবীর রণজিৎ রায়।

বিহারাধিপতি

রাজা নৈঋতের পুত্র

শ্রীমানের শিকারে বহির্গমন

ও

মঙ্গলকোট রাজকন্যার সহিত বিবাহ।

প্রায় পঞ্চশত বৎসর অতীত হইল, উত্তর-বিহার প্রদেশে নৈঋত নামে এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি স্বয়ং অতি শান্তপ্রকৃতি হইলেও তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ উগ্রস্বসভাব, সাহসী ও শিকারপ্রিয় ছিলেন। একদা শ্রীমান্ একাকী অশ্বারোহণে দেশভ্রমণ করিতে বহির্গত হন। ক্রমে ক্রমে তিনি নানা জনপদ অতিক্রম করিয়া অবশেষে বঙ্গদেশের অন্তর্গত "মঙ্গলকোট" নামক স্থানে উপস্থিত হন। মঙ্গলকোটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রীমান্ দীর্ঘকাল সেই স্থানে বাস করেন। তিনি কিছুদিন মঙ্গলকোটে অবস্থান করিলে তত্রত্য রাজা তাঁহার পরিচয় পাইয়া সাদরে তাঁহাকে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া যান।

শ্রীমান্ মঙ্গলকোটে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে থাকেন। তাঁহার সুন্দর ও বলবান্ দেহ, অমায়িক ভাব, সরল ব্যবহার, দয়া-দাক্ষিণ্য, পরোপকারিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ দেখিয়া রাজ্যের সমস্ত লোকেই তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে।

মঙ্গলকোটের রাজা গজপতির "সুরূপা" নাম্নী এক পরম-রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিল। সুরূপা ভিন্ন রাজার অন্য সন্তান ছিল না, সে জন্য রাজা রাণী একমাত্র কন্যাকে পরম যত্নে লালন-পালন করিতেন ও প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন।

রাজা কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিতে অত্যন্ত অভিলাষী ছিলেন। তাঁহার কন্যা রূপে গুণে অদ্বিতীয়া ছিল। অনেক রাজপুত্র সুরূপার রূপ-গুণের কথা শুনিয়া তাহার পাণিগ্রহণ-প্রার্থী হইয়াছিল। কিন্তু রাজা কন্যার অনুরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন পাত্র না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কন্যার বিবাহ-যোগ্য বয়স উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া রাণী শীঘ্র সুরূপাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য রাজাকে ব্যস্ত করিতে লাগিলেন। রাজা, রাণীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে—বীর, সাহসী, উচ্চবংশোদ্ভব ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত যুবক রাজপুত্র না পাইলে প্রিয়তমা কন্যার বিবাহ দিবেন না; যদি তাহাকে চিরকুমারী রাখিতে হয় তাহাও ভাল।

মঙ্গলকোটরাজ কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে একরূপ হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন; কন্যার বয়সও বিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। এমন সময় ভগবান্ রূপলাবণ্যবতী কন্যা সুরূপার অনুরূপ পাত্র

মঙ্গলকোট রাজ্য মধ্যেই প্রেরণ করিলেন। কোশলাধিপতি মহারাজ নৈঋতের পুত্র শ্রীমানের রূপগুণে বিমুগ্ধ হইয়া মঙ্গল-কোটরাজ তাঁহার হস্তে স্বীয় প্রাণাধিকা কন্যা সুরূপাকে অর্পণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। রাণী এবং রাজ্যস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সকলেই শ্রীমান্‌কে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিলেন। বিবাহ শুভ লগ্নে সুসম্পন্ন হইল।

শ্রীমান্ ও সুরূপার বন্যপশু-শিকার।

শ্রীমান্ অত্যন্ত সাহসী ও শিকারপ্রিয় ছিলেন। শিকারে বহির্গত হইলে তিনি আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন। তিনি শিকার করিতে করিতে বিহার প্রদেশ হইতে মঙ্গলকোট রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। শিকারকার্য্য তাঁহার এতই প্রিয় ছিল যে যদি কোন দিন কোনও কারণে শিকারে গমন করিতে না পারিতেন, সেদিন তাঁহার অত্যন্ত মনোকষ্ট হইত।

কিন্তু বিবাহের পর হইতে সুরূপা তাঁহার প্রতি এতই আসক্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে অতি সামান্য সময়ের জন্যও তিনি শ্রীমান্‌কে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। শ্রীমান্ শিকারে বহির্গত হইলেই সুরূপার আকর্ণবিশ্রান্তনয়নযুগল হইতে অবিরলধারে অশ্রু বিগলিত হইত। যতক্ষণ না শ্রীমান্ পুনরায় গৃহে আগমন করিতেন ততক্ষণ কেহই সুরূপাকে সান্ত্বনা দিতে পারিত না। শিকারপ্রিয় শ্রীমান্ পরমসৌন্দর্য্যবতী, প্রিয়তমা সাধ্বী পত্নীর এবংবিধ আচরণ দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। শিকারে না যাইলেও তাঁহার প্রাণে শান্তি থাকিত না, আবার বাটীর বাহিরে গমন করিয়া অধিকক্ষণ থাকিলেই প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যার নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা উপস্থিত হইত।

শ্রীমান্ একদিন পতিপ্রাণা রমণীর মনস্তুষ্টির জন্য শিকারে গমন করিলেন না।

শ্রীমান্ দিবাভাগ কোনও প্রকারে যাপন করিলেন বটে কিন্তু রাত্রিতে তাঁহার এতই কষ্ট হইতে লাগিল যে সমস্ত রজনী অনিদ্র অবস্থায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। মুনিমনোহারিণী, দেব-দুর্লভকান্তিশালিনী সাধ্বী সতী সুরূপা অবিশ্রান্ত সেবা করিয়াও স্বামীর কষ্টের লাঘব করিতে পারিলেন না। অবশেষে জীবন-সর্ব্বস্ব পতির পদকমল মৃণালভুজে বেষ্টন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"স্বামিন্! আর আমার নিজ সুখের আশায় আপনার প্রাণে এত কষ্ট দিব না। জীবিতেশ্বর! আপনার সুখেই আমার সুখ, আপনার দুঃখেই আমার দুঃখ। আপনাকে চক্ষের অন্তরাল করিলে, হৃদয় গাঢ় দুঃখতিমিরে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাই আপনার মুখচন্দ্র সর্ব্বদা নয়নে নয়নে রাখিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু হায়! অভাগিনীর কপাল-দোষে সে সুখ আজ দুঃখে পরিণত হইল! দুর্ভাগ্যবশতঃ অমৃত, হলাহল হইয়া প্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। প্রাণেশ্বর! আর আপনাকে কখনও শিকারে যাইতে নিষেধ করিব না। আপনার এই কষ্ট আমার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইতেছে। আমি অতি পাপীয়সী। তাহা না হইলে কি স্বীয় সুখআশায়, নারীর একমাত্র গতি প্রাণ-পতির এত যন্ত্রণা উৎপন্ন করিতে সাহসী হইতাম। নাথ! আমায় ক্ষমা করুন। আপনার অদর্শনে আমার জীবন যদি এই অকিঞ্চিৎকর দেহ ত্যাগ করিয়া আপনার অনুসরণ করে, সেও আমার পক্ষে পরম শ্লাঘা ও সুখের বিষয়।

সতীশিরোমণি রমণীর এবংবিধ সুললিত ও প্রেমপূর্ণ বাক্য

শ্রবণ করিয়া শ্রীমানের বীরহৃদয় প্রেমরসে একেবারেই বিগলিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এরূপ পতিব্রতা কামিনী যাহার সহধর্ম্মিণী, এই দুঃখময় সংসারে তাহার ন্যায় সুখী আর কে হইতে পারে। আমি ধন্য। আমার দারপরিগ্রহ সার্থক।

তৎপরে শ্রীমান্ স্বীয় কান্তার সুকোমল ভুজবল্লী ধারণ করিয়া প্রেমবিজড়িত স্বরে সাদরে বলিতে লাগিলেন, "জীবনতোষিণি! তোমার অলৌকিক পতিপরায়ণতায় আমি যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি তাহা ব্যক্যাতীত। প্রাণেশ্বরি! তুমি রমণীকুলের আদর্শ। তোমার ন্যায় পতিব্রতা রমণী যাহার অর্দ্ধাঙ্গিণী, এ অভাবপূর্ণ পৃথিবীতে তাহার কিসের অভাব। তুমি মহাশক্তি রূপে আমার চিরসঙ্গিণী হইয়া মহাশক্তিতে আমায় অনুপ্রাণিত কর। তোমার প্রাণ তোমার দেহ ত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ করিবে কেন? তুমি রাজপুত্রী, রাজার পুত্রবধূ, বীরপত্নী সশরীরে তোমার প্রাণ কি আমার সহগমন করিতে পারে না?

এই কথা শুনিয়া সুরূপা হর্ষোৎফুল্ল নয়নে শ্রীমানের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "নাথ! দাসী আপনার নিতান্ত অযোগ্যা পত্নী নহে—অশ্বারোহণে, তরবারি চালনে ও বর্ষাক্ষেপণে যৎকিঞ্চিৎ অভ্যস্তা আছে—আজ্ঞা পাইলেই দাসী সহর্ষে প্রভুর অনুগমন করিতে পারে।"

পরদিন হইতে সুরূপা পিতা মাতার অনুমতি লইয়া শিকারে স্বামীর অনুগমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে সুখে সচ্ছন্দে কয়েক বৎসর গত হইলে সুরূপা গর্ভবতী হইলেন। শ্রীমান্

শিকারগমন পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যার মনস্তুষ্টির জন্য প্রায় সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গ করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিছু দিন অতীত হইলে, তিনি একদিন নিশাযোগে স্বপ্ন দেখিলেন যে তাঁহার পিতা শত্রুহস্তে পরাজিত ও হৃতরাজ্য হইয়া অতি দীনভাবে কালযাপন করিতেছেন ও তাঁহার রাজরাণী স্নেহময়ী জননী কাঙ্গালিনীবেশে "হা পুত্র শ্রীমান্! হা পুত্র শ্রীমান্! তুমি কোথায় যাইলে! তোমার অভাবে তোমার পিতামাতার কি দুর্দ্দশা হইয়াছে দেখিয়া যাও" বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতেছেন।

শ্রীমান্ এই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়া হঠাৎ শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"মা! ভয় নাই। এই আমি যাইতেছি। যে পাষণ্ড তোমাদের উপর অত্যাচার করিয়াছে, তাহার মস্তক দেহচ্যুত না করিয়া কিছুতেই আমি নিরস্ত হইব না।"

শ্রীমানের এই ভয়ঙ্কর চীৎকারে আবদ্ধগৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। মহা আতঙ্কে স্বরূপার নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্বরূপা শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া রোষকষায়িতলোচন, বদ্ধমুষ্টি স্বামীর তথাবিধ ভাব দর্শন করিয়া সভয়ে ও বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "দেব! অকস্মাৎ আপনার এইরূপ ভয়ঙ্কর ভাব কেন হইল? পুরী মধ্যে কি কোন আততায়ী প্রবেশ করিয়াছে— যাহার শাসনের জন্য আপনি এরূপ রুদ্রভাব ধারণ করিয়াছেন? না, অন্য কোন অশুভ সংঘটন হইয়াছে, যাহার প্রতিবিধান

করিতে অগ্রসর হইয়াছেন? হৃদয়বল্লভ! শীঘ্র বলুন—কি হইয়াছে—দাসী আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছে না।"

স্বরূপার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমান্ কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে! এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন আমার চিত্তকে এতাদৃশ আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে! আমি যেন এখনও দেখিতেছি—এক দুর্দ্দান্ত শত্রু কর্তৃক পিতা আমার, পরাস্ত ও রাজ্যহীন হইয়াছেন এবং মা আমার, দীনবেশে পাগলিনীর ন্যায় "হা পুত্র! হা পুত্র!" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। ধিক্! আমায়! আমি পত্নীর প্রেমে এতদূর মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি—যে পিতামাতাকে পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়াছি! হায়, আমি পশুর অধম! আমি নরকের কীট! আমি ঘোর পাষণ্ড! তাহা না হইলে কি আমি প্রত্যক্ষ দেবতা পিতামাতাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতাম! প্রিয়ে! প্রাতঃকালেই আমি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিব। তুমি নির্ব্বিঘ্নে পুত্র প্রসব কর। প্রসবান্তে তোমাকে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিব।

স্বরূপা স্বামীর স্বপ্নবৃত্তান্ত ও স্বদেশগমনে দৃঢ়সঙ্কল্প শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, প্রভো! আপনি ত জানেন, আমি আপনাকে ছাড়িয়া তিলার্দ্ধ বাঁচিতে পারি না; আমাকেও আপনি চিরসঙ্গিনী করিয়াছেন। তবে কি জন্য আমায় একাকিনী এখানে রাখিয়া স্বদেশে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। স্বদেশগমন যদি একান্তই আপনার অভিমত হয় তবে আমাকে সঙ্গে করিয়া লউন, আমিও আপনার সহিত গমন করিব।

শ্রীমান্ বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি গর্ভবতী। বহুদূর অশ্বারোহণে গমন করিতে হইবে। পথে বিপদের সম্ভাবনা। অতএব তুমি কোনও প্রকারে প্রসবকাল পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে অবস্থান কর।"

কিন্তু সুরূপা স্বামীর কথা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "নাথ! আপনার আজ্ঞার অন্যথাচরণ করিবার সাধ্য আমার নাই। কিন্তু ইহা স্থির জানিবেন,—যে আপনার চিরসঙ্গিনী আপনার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কখনও দেহধারণ করিতে পারিবে না। আপনি যদি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে আমার প্রাণও দেহ ছাড়িয়া আপনার অনুগমন করিবে—আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন।"

এই কথা বলিয়া সুরূপা সাশ্রুনয়নে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। শ্রীমান্‌ও উপায়ান্তর না দেখিয়া সুরূপাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

শ্রীমানের স্বদেশযাত্রা

ও

পথে ঘোর সঙ্কট।

রজনী প্রভাত হইলে শ্রীমান্ স্বদেশগমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সুরূপা মাতার নিকট গমন করিয়া গতরজনীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলেন এবং স্বামীর সহিত শ্বশুরালয়ে গমন করিতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সুরূপার মাতা গর্ভাবস্থায় দূরদেশে গমন করা অবিধেয় বলিয়া কন্যাকে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু সুরূপা কিছুতেই স্বামীকে ছাড়িয়া পিতৃগৃহে থাকিতে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে রাণী উপায়ান্তর না দেখিয়া কন্যার সহিত জামাতার স্বদেশগমন বৃত্তান্ত রাজার গোচরীভূত করিলেন। রাজা শ্রীমান্‌কে প্রাণাপেক্ষা ভাল-বাসিতেন। হঠাৎ তাঁহার স্বদেশগমনের কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীমানের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন—সুরূপার প্রসবান্তে স্বদেশগমনই যুক্তিসিদ্ধ। কারণ গর্ভাবস্থায় বহুদূর গমনে বিপদের বিশেষ সম্ভাবনা।

কিন্তু শ্রীমান্ পিতামাতাকে দেখিবার জন্য এতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন যে তিনি কাহারও কোন অনুরোধ রক্ষা করিলেন না, পরন্তু তদ্দণ্ডেই যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন। সুরূপাও পিতামাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া স্বামীর সহ গমনে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন।

কন্যা ও জামাতার স্বদেশগমনে একান্ত আগ্রহ দেখিয়া রাজা বহু লোক জন ও যান বাহনাদি তাঁহাদের সহিত প্রেরণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীমান্ এ সকল কিছু না লইয়া কেবল একটী বিশ্বস্তা পরিচারিকা লইয়া অশ্বারোহণে সস্ত্রীক স্বীয় ভবনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কয়েকদিন অবিশ্রান্ত গমনের পর শ্রীমান্ সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক পর্ব্বতাকীর্ণ অরণ্যময় স্থানে উপস্থিত হইলেন। পথশ্রমে গর্ভবতী স্বরূপা এতই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সম্পূর্ণ বিশ্রাম তাহার একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িল। কাজেই শ্রীমান্ সেই অরণ্যময় স্থানে দুই এক দিন অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

তিনি অশ্বগণকে বৃক্ষকাণ্ডে আবদ্ধ করিয়া বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর এক পর্ব্বতগুহা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। শ্রীমান্ গর্ভবতী পত্নীকে সেই গুহায় লইয়া গেলেন এবং আসন বিস্তীর্ণ করিয়া তাঁহাকে তদুপরি শয়ন করাইলেন। তৎপরে স্বয়ং স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সশস্ত্র গুহাদ্বারে উপবিষ্ট রহিলেন।

পরিচারিকা রন্ধনাদির আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইল। খাদ্যদ্রব্য তাঁহাদের সঙ্গেই ছিল, কিন্তু রন্ধন ও পানের জন্য জলের আবশ্যক হইয়া উঠিল। সুতরাং পরিচারিকা কিয়দ্দূরবর্ত্তী এক ঝরণা হইতে জল আনিতে গমন করিল।

তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জ্যোৎস্নার অস্ফুট আলোক বনদেশে পতিত হইয়া ছায়ালোকের এক অপূর্ব্ব

সম্মিলন সমুৎপন্ন করিয়াছে। পরিচারিকা এই ক্ষীণ আলোক সাহায্যে পাত্রহস্তে ঝরণার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই শ্রীমান্ ব্যাঘ্রের ভীষণ গর্জ্জন ও পরিচারিকাব আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন। সুরূপাও এই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ কবিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। শ্রীমান্ সুরূপাকে আত্মরক্ষা করিতে বলিয়া সুতীক্ষ্ণ বর্শা হস্তে ঝরণাব দিকে সবেগে ধাবিত হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ঝবণাব নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন পাত্রটী পড়িযা রহিয়াছে, পবিচারিকা নাই। শ্রীমান্ উন্মত্তের ন্যায় চাবিদিক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে পবিচাবিকাব নাম ধবিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। তিনি পবিচাবিকার কোন উদ্দেশই করিতে পারিলেন না। অবশেষে বিফল মনোরথ হইয়া শোকভারগ্রস্ত-হৃদযে সুরূপার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই আকস্মিক বিপৎপাতে সুরূপা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং বনমধ্যে ব্যাঘ্রেব অনুসন্ধান করিবার জন্য স্বামীকে বারম্বার অনুরোধ কবিতে লাগিলেন।

শ্রীমান্ পত্নীকে একাকিনী ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকৃত হইলে—সুরূপাও সশস্ত্র পতির সহিত ব্যাঘ্রঅন্বেষণে গমন করিতে অভিলাষিনী হইলেন।

শ্রীমান্ এই মহাবিপদের সময় কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পাবিয়া সুরূপার সহিত তাঁহার বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং জ্যোৎস্নার ক্ষীণ আলোক সাহায্যে বনপ্রদেশে

ব্যাঘ্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শ্রীমানের অশ্ববর শিকার কার্য্যে অত্যন্ত সুদক্ষ ছিল। সুশিক্ষিত ঘোটক ক্রমশঃ গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। এইরূপে বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে অশ্ব হঠাৎ থামিয়া বিকট হ্রেষারব করিল।—শ্রীমান্ সুরূপাকে এক হস্তে তাঁহার কটিদেশ দৃঢ় রূপে বেষ্টন করিয়া ধরিতে বলিলেন এবং অন্য হস্তে বর্শা ধারণ করিয়া ব্যাঘ্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন—বলিতে বলিতে নরশোণিত-লোলুপ ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র একলম্ফে অশ্বের পশ্চাদ্দেশে আসিয়া পড়িল। সুদক্ষ ঘোটক তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রের দিকে ফিরিল। দুইটী সুতীক্ষ্ণ বর্শা বিশাল ব্যাঘ্রদেহ যুগপৎ বিদ্ধ করিল।

ভীষণ শার্দ্দূল বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ধরাশায়ী হইল। শ্রীমান্ একলম্ফে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইলেন, এবং ব্যাঘ্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া সবলে বর্শাদ্বয় ভীষণ পশুর শরীর হইতে উত্তোলিত করিলেন। তৎপরে ইতস্ততঃ পরিচারিকার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পরিচারিকার রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখিয়া উহা স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন এবং ধীরে ধীরে গুহাদ্বারে উপনীত হইলেন। শ্রীমান্ ও সুরূপা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া মৃতদেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে পরিচারিকার যথাসম্ভব সৎকারাদি করিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে উভয়ে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পথিমধ্যে সুরূপার সন্তান প্রসব।

অনন্তর শ্রীমান্ ও সুরূপা অশ্বারোহণে ধীরে ধীরে স্বদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রায় একপক্ষকাল পরে তাঁহারা গঙ্গার তটদেশে উপনীত হইলেন। পূর্ণগর্ভা সুরূপা পথশ্রমে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কটিদেশের অসহ্য বেদনায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন।

কাযেই শ্রীমান্ গঙ্গার সেই নির্জ্জন তটভূমিতেই সুরূপাকে শয়ন করাইলেন। সুরূপা যন্ত্রণায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। শ্রীমানের মনে এইবার ভয়ের উদয় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে যদি তাঁহার পত্নী এই অসহায় অবস্থায় সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে মহা বিপদে পড়িতে হইবে।

প্রকৃতই বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরূপার গর্ভ অষ্টম মাস অতিক্রম করিয়াছিল, প্রসববেদনায় তাহাকে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া ফেলিল। শ্রীমান্ যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সুরূপা এক সুন্দর কুমার প্রসব করিল।

শ্রীমান্ স্বয়ং শিশুর নাড়ীচ্ছেদ করিয়া দিলেন, এবং গঙ্গা হইতে জল আনিয়া সুরূপা ও শিশুর দেহ উত্তমরূপে ধৌত করিলেন। অনন্তর সুরূপাকে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করাইয়া শিশুর দেহ রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিলেন; এবং কিছু কাষ্ঠ সংগ্রহ

করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিলেন। এইরূপ পরিচর্য্যায় সুরূপা প্রকৃতিস্থ হইয়া শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। শিশু তখনও স্তন্যপান করিতে সমর্থ হয় নাই, কাযেই উহার প্রাণরক্ষার জন্য একটু গোদুগ্ধের আবশ্যক হইল। কিন্তু যে স্থানে তাঁহারা অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে কোনও লোকালয় ছিল না। সেই স্থানের প্রায় এক ক্রোশ দূরে লোকজনের বাস আছে বলিয়া বোধ হইল।

শ্রীমান্ সুরূপাকে সবিশেষ সতর্ক থাকিতে বলিয়া অশ্বারোহণে সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের দিকে সবেগে ধাবিত হইলেন। দুগ্ধ আহরণ করিতে তাঁহার প্রায় একঘণ্টা সময় অতীত হইল। দুগ্ধ লইয়াই তিনি অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং যে স্থানে পত্নী ও সদ্যোজাত শিশু পুত্রকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই দিকে ছুটিলেন।

হিরালাল নামক এক দুর্ব্বৃত্ত বণিক কর্ত্তৃক সুরূপার উপর অত্যাচার।

শ্রীমান্ দুগ্ধান্বেষণে যাইবার ক্ষণকাল পরেই কঙ্কনগ্রামবাসী হিবালাল নামক এক বণিক নৌকাযোগে গমন করিতে করিতে যে স্থানে সুরূপা সদ্যপ্রসূত শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার অনতিদূরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নির্জ্জন তটভূমিতে বিদ্যুল্লতাসদৃশ উজ্জ্বল লাবণ্যময়ী একাকিনী রমণীকে দেখিয়া হিরালাল কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া নাবিকগণকে নৌকা তীরসংলগ্ন করিতে আদেশ করিল। তরণী তীরলগ্ন হইলে বণিক রমণীর নিকট গমন করিল এবং তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া কিয়ৎক্ষণ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। রমণীর রূপে হিরালালের এতই মোহ উপস্থিত হইল যে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তাহার মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল। রমণীকে একাকিনী ও অসহায় দেখিয়া হিরালাল স্বীয় দুষ্ট বাসনা চরিতার্থ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিল না। অনুচরগণের সাহায্যে সবলে সদ্যপ্রসূতা সুন্দরীকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল।

গাত্রস্পর্শ মাত্র সুরূপা শিশুপুত্রকে ক্রোড়ে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া একবার উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, পরক্ষণেই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল।

নৌকা গঙ্গাবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সবেগে পূর্ব্বমুখে ছুটিতেছে। হতভাগিনী স্বরূপা চৈতন্যহীন হইয়া আকাশভ্রষ্ট নক্ষত্রের ন্যায় নৌকাগর্ভে পড়িয়া আছে।

শিশুপুত্র যে প্রাণপণে রোদন করিতেছে তাহা স্বরূপাব কর্ণবিবরে প্রবেশ করিতেছে না।

নৌকা কিয়দ্দূর পূর্ব্বমুখে গমন করিয়া দক্ষিণ মুখে ফিরিল। সেই স্থানের তটভূমি গহন অরণ্যে পূর্ণ। পাপিষ্ঠ নরপিশাচ হিরালাল শিশুটীকে অরণ্যময় তটভূমিতে নিক্ষেপ করিবার জন্য নাবিকগণকে নদীর অন্য পারে নৌকা সংলগ্ন করিতে আদেশ করিল। আদেশ যথাযথ পালিত হইলে, পাপকার্য্যের বিঘ্ন উৎপন্নকারী স্বর্গীয় শিশুটীকে নদীতীরস্থ অবণ্যমধ্যে নিক্ষেপ করা হইল। অনন্তর নাবিকগণ তীরবেগে নৌকা চালাইয়া দিল।

—*—

শিশুর জীবন রক্ষা।

শিশু যে স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই স্থান দৈবক্রমে সুগন্ধীপুষ্পসমাকীর্ণ একপ্রকার সুকোমল লতাগুচ্ছে আচ্ছন্ন ছিল। সেইজন্য শিশুটী কিছুমাত্র আঘাতপ্রাপ্ত হয় নাই। সহস্র সহস্র প্রস্ফুটিত পুষ্পের মধ্যে শিশু পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অদূরেই অরণ্যমধ্যে যোগীন্দ্র বহ্মচারী নামক এক শক্তিউপাসক ব্রাহ্মণের আশ্রম ছিল। ব্রাহ্মণের পরিচারিকা নির্জ্জনগঙ্গাতীরে কুসুমচয়ন করিতে করিতে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবন করিয়া অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সেই দিকে আগমন করিল এবং একটী অসহায় রোরুদ্যমান শিশুকে অসংখ্যপুষ্পমধ্যে পদ্মের ন্যায় শোভমান দেখিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ ক্রোড়ে লইয়া আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিল। তদনন্তর আশ্রমবাসিনী রমণী ব্রহ্মচারীর অনুমতিক্রমে শিশুকে মাতৃবৎ লালনপালন করিতে আরম্ভ করিল।

—*—

দুগ্ধ লইয়া শ্রীমান্ গঙ্গাতীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং স্ত্রী-পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া তাহাদের অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন।

শ্রীমান্ পল্লীমধ্যে পত্নী ও পুত্রের জন্য দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব দ্রুতবেগে গঙ্গাতটে উপনীত হইলেন; কিন্তু স্ত্রী ও পুত্র কাহাকেও-দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও ভীত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন কোন হিংস্র বন্যপশু কি তাহাদিগকে লইয়া গিয়াছে কিম্বা যে স্থানে তাহারা ছিল ভ্রমক্রমে সে স্থানে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই; অথবা তাঁহার পত্নীই শিশুপুত্রকে লইয়া কোন কারণে স্থানান্তরে গিয়াছেন।

এই প্রকার নানারূপ দুশ্চিন্তায় তাঁহার হৃদয় অতিশয় আলোড়িত হইতে লাগিল। তিনি কাতরভাবে উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় ভার্য্যার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, তটদেশে ইতস্ততঃ

অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কোন্ দিকে যাইলে স্ত্রী-পুত্রকে পাইবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত করিয়া তিনি স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই কোন হিংস্র-জন্তু তাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে লইয়া বনমধ্যে প্রস্থান করিয়াছে। ইহা ভাবিয়া তিনি অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইলেন এবং অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক অরণ্য-ময় পূর্ব্বদিক লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন। গঙ্গাতীর ধরিয়া এইরূপে ছুটিতে ছুটিতে দেখিতে পাইলেন দূরে একখানি তরণী পালভরে নদীবক্ষে দ্রুতবেগে ভাসিয়া যাইতেছে। নৌকারোহী-গণ তাঁহার স্ত্রীপুত্রের কোন সংবাদ দিতে পারে কি না জানিবার জন্য কশাঘাত করিয়া অতি দ্রুতবেগে তিনি অশ্ব চালিত করিলেন। অশ্ববর নক্ষত্রবেগে ছুটিল। বেগবান্ তুরঙ্গমের ক্ষুরোত্থধ্বনিতে বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। অল্পক্ষণের মধ্যে শ্রীমান্ তরণীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। নৌকাখানি তীরের নিকট দিয়াই যাইতে-ছিল। শ্রীমান্ উচ্চৈঃস্বরে নাবিকদিগকে ডাকিতে লাগিলেন।

হিরালাল অতি যত্নের সহিত নৌকামধ্যে স্বরূপার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া অতি মিষ্টভাষায় তাহাকে নানারূপ প্রবোধবাক্য বলিতেছিল। হঠাৎ অশ্বের পদশব্দ ও বীরজনোচিত উচ্চ আহ্বানধ্বনি শ্রবণ করিয়া হিরালাল ত্রস্তভাবে নৌকার বাহিরে আসিল এবং তীরস্থ সশস্ত্র অশ্বারোহী যুবককে দেখিয়া সভয়ে নাবিকগণকে অধিকতর দ্রুতবেগে নৌকা চালাইতে আদেশ করিল। নাবিকগণ যুবকের কথায় কোন উত্তর না দিয়া নৌকা

চালাইতে লাগিল। হিরালাল আবার নৌকামধ্যে সুরূপার নিকট গিয়া উপবিষ্ট হইল।

নাবিকগণের এইরূপ আচরণ দেখিয়া শ্রীমানের মনে গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"রে ধৃষ্ট নাবিকগণ, যদি নৌকা থামাইয়া আমার কথার উত্তর না দেও, তবে সকলকেই এখনই শমনসদনে প্রেরণ করিব।" এই বলিয়া শ্রীমান্ শরাসনে শরযোজনা করিলেন। তখন নাবিকগণ ভয় পাইয়া বলিল,—"মহাশয়, আমরা বিশেষ আবশ্যক বশতঃ দ্রুতবেগে স্বদেশাভিমুখে গমন করিতেছি, আপনি কি জন্য আমাদের গমনে বাধা দিতেছেন? আপনার কি বক্তব্য আছে বলুন—আমরা যথাসাধ্য উত্তর দিয়া চলিয়া যাইব—দয়া করিয়া আমাদিগকে প্রাণে মারিবেন না।"

তখন শ্রীমান্ বিকৃতস্বরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা নৌকারোহণে আসিতে আসিতে নদীতটে একটী রমণী ও সদ্যপ্রসূত একটী শিশুকে কি দেখিয়াছ?" নাবিকগণ উত্তর করিল,—"না মহাশয়, আমরা দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে গঙ্গা-তটে কোন রমণী কিম্বা কোন শিশু দেখি নাই। এই কথা বলিয়াই নাবিকগণ নৌকা পুনরায় ছাড়িয়া দিল। তন্মুহূর্ত্তেই শ্রীমানের কর্ণে যেন নৌকামধ্যস্থ রমণীকণ্ঠবিনিঃসৃত অস্ফুট রোদনধ্বনি প্রবেশ করিল। তাঁহার হৃদয়ে সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। তাঁহার বক্ষঃ দুরু দুরু কম্পিত হইতে লাগিল, ক্রোধে নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইল, সদর্পে দৃঢ়হস্তে শরাসন ধারণ



করিয়া অতি উগ্রস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"শীঘ্র নৌকা তীরসংলগ্ন ক'র্; নচেৎ কাহারও রক্ষা নাই।"

নাবিকগণ শ্রীমানের বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া নৌকা চালাইতে লাগিল।

শ্রীমান্ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া লম্ফ দিয়া ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং কর্ণধারকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িলেন। তৎক্ষণাৎ কর্ণধার আহত হইয়া জলমধ্যে নিপতিত হইল। অবশিষ্ট নাবিকগণ প্রাণভয়ে নৌকা হইতে লাফাইয়া জলে পড়িল। হিরালাল এই ব্যাপার দেখিয়া চাপহস্তে নৌকার বাহিরে আসিল। হিরালাল লক্ষ্য স্থির করিতে না করিতেই শ্রীমান্নিক্ষিপ্ততীরের আঘাতে বিষম আহত হইয়া গঙ্গাজলে পতিত হইল।

তখন শ্রীমান্ নৌকামধ্যস্থা রমণীর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া সুরূপার কণ্ঠস্বর বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সন্তরণ দ্বারা নৌকাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই নৌকাখানি ধরিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন। সুরূপা স্বামীকে দেখিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। শ্রীমান্ সুরূপার মুখে জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সুরূপার চৈতন্য সম্পাদন হইলে, তাঁহাকে পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুরূপা কাঁদিতে কাঁদিতে অতি কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন—"পাপীষ্ঠগণ যখন আমাকে বলপূর্ব্বক ধৃত

করে, তখনই আমি সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলাম। সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখি, আমি নৌকামধ্যে শায়িত। আমার অঞ্চলের নিধি নাই!"

এই কথা বলিতে বলিতে সুরূপা আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। শ্রীমান্ অতি কষ্টে পুনর্ব্বার তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া নৌকা তীরের দিকে আনিতে লাগিলেন। নৌকাখানি তীরলগ্ন হইলে ধীরে ধীরে সুরূপাকে নৌকা হইতে অবতরণ করাইয়া তটদেশে আনয়ন করিলেন এবং কিছু দুগ্ধ পান করাইয়া তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়ে শয়ন করাইলেন।

এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, আট জন লোক আর্দ্রবস্ত্রে শ্রীমানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। শ্রীমান্ অতি রুক্ষস্বরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোরা কি এই নৌকার নাবিক"?

তাহারা উত্তর করিল,—হাঁ, মহাশয়! আমাদিগকে ক্ষমা করুণ—আমরা আপনার নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছি।"

শ্রীমান্ বলিলেন—"তোরা যদি আমার আজ্ঞামত কার্য্য করিস; তাহা হইলে আমি তোদের প্রাণ রক্ষা করিতে পারি। এই নৌকা এখন আমার। এই নৌকা বাহিয়া যদি তোরা আমাকে ও আমার পত্নীকে পাট্‌না নগরে পৌঁছাইয়া দিতে পারিস্ তাহা হইলে তোদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিব।"

নাবিকগণ শ্রীমানের কথায় স্বীকৃত হইলে শ্রীমান্ ও সুরূপা নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকা পাট্‌না অভিমুখে চলিল।

শ্রীমান্ নাবিকগণের নিকট শিশু পুত্রের নিক্ষেপবার্ত্তা শ্রবণ

করিয়া সেই স্থান বিশেষরূপে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু শিশুকে দেখিতে না পাইয়া স্থির করিলেন, বোধ হয় কোন হিংস্রজন্তু শিশুকে ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। অনন্তর শ্রীমান্ ও সুরূপা পুত্রের জন্য অত্যন্ত দুঃখ ও শোক প্রকাশ করিতে করিতে কিছুদিন পরে পাট্নায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে উভয়ে গৃহে গমন করিয়া পিতা-মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। বৃদ্ধ রাজা নৈঋত পুত্র শ্রীমান্‌কে বহুকাল পরে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার হস্তে রাজ্য-ভার অর্পণ করতঃ নিশ্চিন্ত হইলেন।



রণজিতের বাল্যজীবন।

ব্রহ্মচারীর পরিচারিকা কর্ত্তৃক শিশুর লালন-পালন।

ব্রহ্মচারীর পরিচারিকা কুসুমচয়নার্থ বনময় তটে আগমন করিয়াছিল; সেই নির্জ্জন স্থানে শিশুর রোদন ধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। ক্রন্দনধ্বনি লক্ষ্য করিয়া কৌতুহল-পরবশ পরিচারিকা সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনন্তর ফুল্লকুসুমসদৃশ, সুন্দর একটি শিশুকে প্রস্ফুটিত ফুলদলের উপর শায়িত দেখিয়া করুণায় তাহার কোমল অন্তঃকরণ বিগলিত হইল। শশব্যস্তে অসহায় শিশুকে সযত্নে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আশ্রমের দিকে ফিরিতে লাগিল।

ব্রহ্মচারীর পরিচারিকা পতিপুত্রহীনা রাজপুত্তরমণী। পরিত্যক্ত শিশুর প্রতি তাহার অত্যন্ত স্নেহ ও মমতার সঞ্চার হইল। সে শিশুকে লইয়া ব্রহ্মচারীর নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাকে কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে তৎসমুদায় ব্রহ্মচারীকে বলিল।

ব্রহ্মচারী কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া শিশুর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। অনন্তর চমৎকৃত হইয়া পরিচারিকাকে বলিলেন,—"অয়ি রমণি! শিশুকে সযত্নে লালন-পালন কর। এই শিশু

একদিন রাজপদে অভিষিক্ত হইবে। পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আমি স্বয়ং ইহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিব।"

রমণী ব্রহ্মচারীর এই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইল। তাহার পুত্র ছিল না, হঠাৎ পুত্ররত্ন লাভ করিয়া জীবন সার্থক বিবেচনা করিল। তাহার হৃদয়ের সমস্ত দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা শিশুর উপর কেন্দ্রীভূত হইল। রমণী পরম উৎসাহে ও মহোল্লাসে শিশুর লালন-পালনে নিযুক্ত হইল। ছয় মাস বয়সে শিশুর অন্নপ্রাশন দিয়া রাজপুতরমণী তাহাকে অহর্বল নামে অভিহিত করিল। কিন্তু ব্রহ্মচারী প্রস্ফুটিত পদ্মসম প্রফুল্লআননবিশিষ্ট শিশুকে 'রাজীব' নামে সম্বোধন করিতেন।

অসহায় শিশু এইরূপে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া রাজপুত রমণীর স্নেহে ও যত্নে দিন দিন শুক্লপক্ষের শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। দুই তিন বৎসর বয়স হইতেই বালক অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। তাহাকে শাসনে রাখা রাজপুতরমণীর পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িল।

পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমকালে ব্রহ্মচারী বালকের বিদ্যারম্ভ করিলেন। সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি বালক অতি অল্পকালে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিল। ব্রহ্মচারী বালকের কুশাগ্রীয় বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন।

বালক ব্রহ্মচারীকে পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিত, তাঁহার শ্রান্তি অপনোদনের জন্য

পদসেবা করিত এবং তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইত, বালক তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিত।

একদিন বালক অহর্ব্বল পুষ্পচয়ন করিতে করিতে দূরবনে যাইয়া পড়িল। পূজার সময় অতীত হইয়া গেল, অথচ অহর্ব্বল পুষ্পচয়ন করিয়া ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া ব্রহ্মচারী অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ উৎকণ্ঠা ভোগ করিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বালকের অন্বেষণে স্বয়ং বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন ঘোর বনে ভয়ানক দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। বনের পশুগণ প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। ব্রহ্মচারী এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া অহর্ব্বলের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি দ্রুতবেগে গভীর বনমধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া অগ্নির প্রচণ্ড উত্তাপে আর যাইতে পারিলেন না। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, কিছু দূরে একটী বালক অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় মৃতবৎ পড়িয়া আছে।

ব্রহ্মচারী বালককে দেখিয়াই অত্যন্ত ভীত হইলেন। তিনি মনে করিলেন বোধ হয় অহর্ব্বলই অনলে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, এই ভাবিয়া শোকসন্তপ্তহৃদয়ে দ্রুতপদে বালকের নিকট গমন করিলেন। বালক চৈতন্যহীন! তাহার দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ায় বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। ব্রহ্মচারী বালকের দেহ বিকৃত হওয়ায় তাহার নিকটে গমন করিয়াও তাহাকে

চিনিতে পরিলেন না। তবে বয়ঃক্রম অনুমান করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন—এই দগ্ধ বালক নিশ্চয়ই অহর্ব্বল। এই অনুমান করিয়া ব্রহ্মচারী বালককে অতি যত্নের সহিত স্বীয় বক্ষের উপর স্থাপন করিলেন এবং ধীরে ধীরে আশ্রমের দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অতিকষ্টে আশ্রমে উপনীত হইয়া বালকের দেহে নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিলেন এবং তাহার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে বালকের সংজ্ঞা হইল। বালক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহার করুণ আর্ত্তনাদে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। ব্রহ্মচারী তাহার গাত্রে স্নিগ্ধ ঔষধ লেপন করিয়া সস্নেহে ও অতি কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "অহর্ব্বল! তোমার কোন চিন্তা নাই,—তুমি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবে। আমি যে ঔষধ লেপন করিলাম, ইহাতেই তোমার সকল যন্ত্রণার উপশম হইবে। এখন বল দেখি, পুষ্পচয়ন করিবার জন্য তুমি ঐরূপ ঘোর বনে কিজন্য গমন করিয়াছিলে ?

ব্রহ্মচারীর দয়াপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বালক অতি বিনীত ভাবে বলিল,—"মহাশয়, আমাকে অহর্ব্বল বলিয়া কি জন্য সম্বোধন করিতেছেন ? আমার নাম অহর্ব্বল নহে এবং আমি পুষ্পচয়ন করিবার জন্যও বন মধ্যে গমন করি নাই। অহর্ব্বল নামক আপনার পরিচিত কোন বালক বোধ হয় পুষ্পচয়নার্থ বনমধ্যে গমন করিয়া থাকিবে এবং হঠাৎ দাবানল প্রজ্জ্বলিত

হইলে আপনি বোধ হয় তাহারই অন্বেষণে বনমধ্যে আসিয়া আমাকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া থাকিবেন। আমাব শরীর দগ্ধ হইয়া বিকৃত হইবার জন্যই আপনি আমাকে অহর্ব্বল বলিয়া ধারণা করিয়াছেন।

কিন্তু আমি অহর্ব্বল নহি। আমি সদ্‌গোপ বংশোদ্ভব। আমার পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, আত্মীয়-স্বজন এই পৃথিবীতে কেহ নাই। ক্ষুধার তাড়নায় ব্যাকুল হইয়া ফলাহরণের জন্য বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তৎপরে দাবানলে দগ্ধ হইয়া মৃতপ্রায় বনমধ্যে পড়িয়াছিলাম। আপনার দয়ায় আমি আজ প্রাণ পাইয়াছি। আপনি ত্রাণকর্ত্তা পিতা। অনাথ বালক আজ, পিতৃস্নেহ লাভ করিয়া ধন্য হইল।"

ব্রহ্মচাবী ও বালকে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় অহর্ব্বল নানাপ্রকার সুন্দর পুষ্প লইয়া দীপ্তিমান্ সূর্য্যের ন্যায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দেহ হইতে এক অপূর্ব্ব বিদ্যজ্জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। তাহার আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নদ্বয় যেন কোন এক স্বর্গীয় তেজে উদ্ভাসিত হইতেছিল। তাহার সুন্দর মুখমণ্ডল কি জানি কেমন এক অলৌকিক মহিমায় বিমণ্ডিত হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন কোন দেবশিশু স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছে।

অহর্ব্বলকে এবম্প্রকার অবস্থাপন্ন দেখিয়া ব্রহ্মচারী তাহাকে সানন্দে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন এবং সস্নেহে মস্তকাঘ্রাণ ও মুখ-চুম্বন করিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি এতক্ষণ

কোথায় ছিলে? তোমার বরবপু কি যেন এক দিব্যজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। হঠাৎ কিরূপে তোমার এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল? অরণ্যমধ্যে ঘোর দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইলে আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তোমার অন্বেষণে গমন করিয়াছিলাম। তোমার অনুসন্ধান করিতে করিতে গভীর বনপ্রদেশে প্রবেশ করিলাম এবং তোমার সম্মুখে শায়িত এই বালককে দগ্ধাবস্থায় মৃতপ্রায় পতিত দেখিয়া তুমিভ্রমে ইহাকে সযত্নে বক্ষে করিয়া আনয়ন করিয়াছি। তৎপরে দগ্ধস্থানে ঔষধাদি লেপন করিয়া ইহাকে অনেকটা সুস্থও করিয়াছি। এই বালক পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয়। অদ্য হইতে এই বালকও তোমার সহিত আমার আশ্রমেই বাস করিবে।

তোমরা দুই জনে দুই ভ্রাতার ন্যায় একত্র বাস কর। তোমরা আত্মার উন্নতিলাভ করিয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন কর। কিন্তু বৎস, তুমি কিরূপে হঠাৎ এইরূপ দিব্যশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইলে জানিবার জন্য আমার বাসনা বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। শীঘ্র সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট যথাযথ বর্ণন করিয়া আমার ঔৎসুক্য নিবারণ কর।



অহর্ব্বলের ঐশীশক্তি লাভ।

অহর্ব্বল আশ্রয়দাতা ব্রহ্মচারীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার কৌতূহল নিবারণার্থ বলিতে লাগিল, "প্রভো! অদ্য পুষ্পঅনুসন্ধানে ঘোর বনমধ্যে যাইয়া পড়িয়াছিলাম। সে গহন অরণ্যে আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও প্রবেশ করি নাই। বনমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একটী সুন্দর সরোবর আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কাকচক্ষুর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সলিলরাশি বায়ু-প্রবাহে অনুচ্চ তরঙ্গ উৎপন্ন করিয়া আন্দোলিত হইতেছে। দর্শনানন্দ কুমুদকহ্লার প্রস্ফুটিত হইয়া সরোবরকে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। তটদেশে নানা জাতীয় কুসুমের সুগন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইয়াছে। পুষ্করিণীর পূর্ব্বতটে এক সুন্দর কুটীর।

আমি সাজি ভরিয়া পুষ্পচয়ন করিলাম। বহুদূর ভ্রমণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম—তজ্জন্য সরোবর-নীরে হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিয়া এক পুষ্পকুঞ্জে উপবেশন করিলাম। নিদ্রাদেবী অজ্ঞাতে আমার সংজ্ঞা হরণ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইলে হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলাম সম্মুখে এক দীর্ঘকায় সুবর্ণবর্ণ পুরুষ দণ্ডায়মান। সুদীর্ঘ জটাজুট তাঁহার পৃষ্ঠদেশে লম্বমান! ললাটদেশ সিন্দুরপুণ্ড্রকে দীপ্তিশালী। গলদেশে

রুদ্রাক্ষমালা বিলম্বিত। দক্ষিণহস্তে সিন্দুরাঙ্কিত, সুশাণিত ত্রিশূল। বামহস্তে নরকপাল। ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান। সুবলিত বরবপু বিভূতিভূষিত। মহাপুরুষ নির্নিমেষদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন।

নিদ্রাভঙ্গের পর চক্ষুরুন্মীলন করিবামাত্র এই দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার মনে হইল যেন আমি দুঃখজ্বালাময় লোকালয় অতিক্রম করিয়া কৈবল্যধাম কৈলাসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, আর কৈলাসপতি, ত্রিলোকনাথ মহেশ্বর, আমার উপর প্রসন্ন হইয়া বরাভয় দান করিবার জন্য সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

আমি আবার এই মহামহিমময় মহাত্মার রাজীবচরণতলে প্রণত হইলাম। আমার উত্তমাঙ্গ তাঁহার অভয়চরণে স্থান প্রাপ্ত হইল। কি যেন এক বৈদ্যুতিকশক্তি আমার সমস্ত দেহ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। আমার প্রাণে তখন যে কি মহানন্দের উদয় হইয়াছিল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে অসমর্থ। আমি উল্লাসনীরে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহার পদতলে পতিত রহিলাম।

তখন মহাপুরুষ আমার হস্তধারণ করিয়া উত্তোলন করিলেন এবং স্নেহপূর্ণ জলদগম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি রাজপুত্র। দৈবদুর্ব্বিপাকে অতি শৈশবে পরিত্যক্ত হইয়াছ। তোমার দেহেও রাজলক্ষণ বর্ত্তমান। তুমি স্বীয় ভুজবলে সুবিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইবে। এই পাপকলুষিত কালে তুমি হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবে। যবনের অত্যাচার হইতে গো, ব্রাহ্মণ, নারী ও

দেবালয় রক্ষা করিয়া তুমি এই বঙ্গদেশে অতুল কীর্ত্তিধ্বজা উত্তোলিত করিবে। তোমার বীরত্বে শত্রুগণের হৃদয় সভয়ে কম্পিত হইবে। দেশের দুঃখ দূর হইবে। পাপ, তাপ দূরে পলায়ন করিবে। সুখ, সমৃদ্ধিতে দেশ আবার হাসিয়া উঠিবে। অভাব কখনও তোমার রাজ্যসীমায় পদার্পণ করিতে সাহসী হইবে না। বৎস! বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে। তুমি স্বস্থানে গমন কর। তোমার আশ্রয়দাতা ব্রহ্মচারী তোমার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।"

এই কথা বলিতে বলিতে সেই শিবকল্প মহাপুরুষ আমার মস্তকে ত্রিশূলাগ্রভাগ স্পর্শ করাইলেন। অমিতশক্তিতরঙ্গ আমার দেহমধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিল। আমি নতজানু হইয়া তাঁহার চরণদ্বয় দুই হস্তে ধারণ করিলাম। নয়নদ্বয় হইতে দরবিগলিতধারে অশ্রুবারি পতিত হইতে লাগিল। আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। ইচ্ছাসত্ত্বেও আমি কথা কহিতে পারিলাম না। মহাত্মা আমার এই ভাব সন্দর্শন করিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, "বৎস! আমি তোমার দেহে দিব্যশক্তি সঞ্চার করিয়াছি। এই শক্তিবলে তুমি পৃথিবীবিজয়ী হইবে। রণস্থলে তোমার সহিত যুদ্ধে অসাধারণ মহাবীরগণও স্থির থাকিতে পারিবে না। দেব, দ্বিজে যতদিন তোমার ভক্তি থাকিবে, যতদিন তুমি হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিতে সযত্ন থাকিবে, ততদিন এই অমোঘ দিব্যশক্তি তোমার দেহে বিরাজিত থাকিয়া তোমাকে অজেয় করিয়া রাখিবে।"

এই বলিয়া মহাত্মা দ্রুতপদে সেই স্থান পবিত্যাগ করিয়া কুটীরাভিমুখে গমন করিলেন। কিছুক্ষণ আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যতক্ষণ না তিনি কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ততক্ষণ আমার চক্ষে পলক পড়িল না। তিনি অদৃশ্য হইলে আমার প্রাণ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। আমার মনে হইল ছুটিয়া কুটীরমধ্যে প্রবেশ করি· এবং দিব্যজ্যোতিপূর্ণ সেই প্রাণারাম দেহ দর্শন করিয়া প্রাণমন সার্থক করি। কিন্তু তাঁহার আজ্ঞার অন্যথা করিতে সাহস হইল না। কাযেই ভগ্ন-হৃদয়ে. অতি অনিচ্ছার সহিত পুষ্প লইয়া গৃহাভিমুখে আসিতে আরম্ভ করিলাম।

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে আশ্রম-পরিচারিকা রাজপুত-রমণী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎপরে অহর্ব্বলকে অনুসন্ধান করিতে গমন করিয়া বনমধ্যে কিরূপে ব্রহ্মচারী সেই দগ্ধ বালককে প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া রমণী নিরতিশয় আহ্লাদিত হইল। ব্রহ্মচারী সেই নিরাশ্রয় বালকেরও পালন-ভার পরিচারিকার হস্তে অর্পণ করিলেন। রাজপুতরমণী সেই বালকের নাম বহর্ব্বল রাখিল এবং অহর্ব্বলের ন্যায় তাহাকেও সস্নেহে পালন করিতে লাগিল।

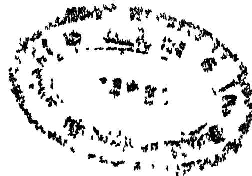
অহর্ব্বল নিজভুজবলে সুবিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইবে মহাপুরুষের এই অমোঘ আশীর্ব্বাদ-বাণী শ্রবণ করিয়া রাজপুতরমণী অহর্ব্বলের রণ-কৌশল শিক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচনা

করিল এবং ইহার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য ব্রহ্মচারীকে বিশেষ অনুরোধ করিল।

তৎকালে বঙ্গ ও দক্ষিণ বিহারের মধ্যবর্ত্তী এক পার্ব্বত্য স্থানে 'কালিদাস' নামক একজন পরাক্রমশালী রাজা রাজত্ব করিতেন। ব্রহ্মচারী তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন। তিনি অহর্ব্বলের যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষার জন্য নিজমন্ত্রশিষ্য কালিদাসের নিকট তাহাকে রাখিয়া আসিতে মনস্থ করিলেন।

অহর্ব্বল, বহর্ব্বলকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিত। ভ্রমণে, ভোজনে, শয়নে বহর্ব্বল তাহার চিরসঙ্গী ছিল। রণ-কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য রাজা কালিদাসের নিকট গমন করিবার সময় অহর্ব্বল বহর্ব্বলকে সঙ্গে লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ব্রহ্মচারী স্বীকৃত হইলে দুইজনেই মাতার চরণ-বন্দনা করিয়া অস্ত্র-শস্ত্র-শিক্ষার জন্য আশ্রম হইতে প্রস্থান করিল। ব্রহ্মচারী তাহাদিগকে লইয়া রাজার নিকট রাখিয়া আসিলেন।





অহর্ব্বল ও বহর্ব্বলের যুদ্ধ-শিক্ষা।

ব্রহ্মচারী বালকদ্বয়ের সহিত রাজা কালিদাসের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা গুরুদেবকে সমাগত দেখিয়া সহর্ষচিত্তে ভক্তিনম্রমস্তকে ব্রহ্মচারীর চরণে প্রণত হইয়া পাদ্যার্ঘ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার বন্দনা করিলেন এবং উপবেশনের জন্য আসন প্রদান করিলেন। ব্রহ্মচারী আসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজাব মস্তকে ধান্য-দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর রাজা যথাসাধ্য পরিচর্য্যার দ্বারা গুরুদেবের শ্রান্তি অপনোদন করিলেন এবং অতি বিনীতভাবে বালকদ্বয়ের পরিচয় ও তাহাদিগকে লইয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রহ্মচারী বালকদ্বয়ের যথাসম্ভব পরিচয় প্রদান করিয়া রাজ-সকাশে তাঁহার গমনের কারণ বিবৃত করিলেন। রাজা গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বালকদ্বয়কে রণ-কৌশল শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলে ব্রহ্মচারী রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বীয় আশ্রমো-দ্দেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

পালনকর্ত্তা, আশ্রয়দাতা পিতা চলিয়া যাইলে পর বালকদ্বয় কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিল। রাজা অনেক বুঝাইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন এবং কয়েকদিন তাহাদিগকে রাজ-বাটীতে রাখিয়া অতি যত্নের সহিত নানাবিধ সুখসেব্য রাজভোগ্য দ্রব্যে তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন।

তদনন্তর রাজা সেনাপতির হস্তে বালকদ্বয়কে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "এই বালকদ্বয় গুরুদেবের পালিতপুত্র। যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষার জন্য তিনি ইহাদিগকে আমার নিকট রাখিয়া গিয়াছেন। আমিও গুরুদেবের আদেশক্রমে ইহাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার হস্তে সেই কার্য্যের ভার প্রদান করিলাম। বালকদ্বয় যাহাতে যুদ্ধবিদ্যায় সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইবে।"

সেনাপতি যথা আজ্ঞা বলিয়া রাজাকে অভিবাদন করিলেন এবং বালকদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

অহর্ব্বল ও বহর্ব্বল সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া প্রাণপণে রণ-কৌশল শিক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা অতি শীঘ্র অশ্বারোহণে, অসি ও বন্দুকচালনায় এবং বর্ষানিক্ষেপে পারদর্শী হইয়া উঠিল। দেহের বলে ও অস্ত্র-শস্ত্র-চালন-কৌশলে তাহাদের সমকক্ষ বীর সৈন্য-শ্রেণী-মধ্যে আর কেহই রহিল না।

রাজা সেনাপতির মুখে অহর্ব্বল ও বহর্ব্বলের গুণপনা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন এবং রাজবাটীতে তাহাদের রণ-কৌশল দেখিবার জন্য দিনস্থির করিলেন। নিরূপিত দিনে যুবকগণ রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া অস্ত্রশস্ত্রসুশোভিতকলেবরে নৃপতি-সকাশে সমুপস্থিত হইল।

রাজা কালিদাসের একজন অমিতবলশালী মল্লযোদ্ধা ছিল। দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহার সমতুল্য বীর তৎকালে বঙ্গবিহারে কেহ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই মল্লযোদ্ধার নাম বলদেব।

রাজা অহর্ব্বলকে এই সুপ্রসিদ্ধ বীর বলদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। রাজাজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র অহর্ব্বল সজ্জিত-বেশে রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া বলদেবকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। অসীমশক্তিশালী দীর্ঘায়তবপু বলদেব মত্তকুঞ্জরের ন্যায় বীরত্ব-ব্যঞ্জক পদবিক্ষেপে অহর্ব্বলের সম্মুখীন হইল।

বলদেবের বীরত্ব-গৌরব দেশমধ্যে এরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল যে কোন বীরপুরুষ তাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে এ পর্য্যন্ত সাহসী হয় নাই। কিন্তু অদ্য একজন অল্পবয়স্ক যুবক এই ভীমাবতার মহাবীরের সহিত মল্লযুদ্ধে নিযুক্ত হইবে দেখিবার জন্য রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল।

তাহারা অহর্ব্বলের সুকুমার দেহের অপরূপ-রূপ-মাধুরী দর্শন করিয়া এতদুর বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে একবাক্যে সকলেই যুবককে এই অসমসাহসিকতার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুনয় করিতে লাগিল।

অহর্ব্বল ভীতদর্শকবৃন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নির্ভীকভাবে বলিল, "আপনারা আমার প্রতি মায়াপরবশ হইয়া আমাকে এই মহাগৌরবজনক বীরকার্য্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিতেছেন কেন? আপনাদের কোন চিন্তা নাই। আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারে এরূপ ব্যক্তি এই ধরাধামে আছে বলিয়া বিবেচনা করি না।"

পার্ব্বতীনন্দন দেবসেনাপতি কুমার তারকাসুরবধকালে যেমন রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তদ্রূপ সুকুমার যুবক মহাবীর

বলদেবের সম্মুখে স্পর্দ্ধার সহিত যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল। বিশ্ব-ধ্বংসকারী ঐশীশক্তি তাহার বদনমণ্ডলে ঝলসিতে লাগিল। তাহার আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নদ্বয় মহাশক্তির উন্মাদনায় রক্তিমাভা ধারণ করিল। অহর্ব্বল সুবলিত হস্তদ্বয় প্রসারণ করিয়া একলম্ফে বলদেবের নিকটবর্ত্তী হইল এবং নিমেষমধ্যে তাহার সুদীর্ঘ ভুজদ্বয় ধারণ করিয়া তাহার স্কন্ধদেশে আরোহণ করিল। মনে হইল, যেন মত্ত মৃগেন্দ্র করিকুম্ভ বিদারণ করিবার অভিপ্রায়ে বারণবরের পৃষ্ঠদেশে আরূঢ় হইয়াছে। তৎপরে চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে অহর্ব্বল বলদেবের হস্তদ্বয় এরূপ সবলে আকর্ষণ করিয়া তাহার পশ্চাদ্দেশে ভূমির উপর লম্ফপ্রদান করিল যে বীরশ্রেষ্ঠ বলদেব সেই আকর্ষণ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ভূতলশায়ী হইল।

দর্শকগণ মহোল্লাসে অহর্ব্বলের বিজয় ঘোষণা করিল। প্রাসাদ-গবাক্ষ হইতে বীরকেশরী যুবকের মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাজা আনন্দে আত্মহারা হইয়া সবেগে রণাঙ্গনে প্রবেশপূর্ব্বক বীরত্ব ও সৌন্দর্য্যের আধার, কমনীয়কান্তি অহর্ব্বলের দেহযষ্টি সস্নেহে বক্ষে ধারণ করিলেন। তৎপরে তাহার গলদেশে মণিময় হার পরাইয়া দিয়া, সুবর্ণখচিত একখানি সুন্দর তরবারি তাহাকে পুরস্কার দিলেন।

সকলেই যুবককে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। রাজা সর্ব্বজন-সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন, "হে নাগরিকগণ, অদ্য অহর্ব্বল যেরূপ বীরত্ব ও অদ্ভুত সমর-কৌশল প্রদর্শন করিল

তাহাতে বোধ হয় সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। যদিও অহর্ব্বল বালক, তথাপি যুদ্ধবিদ্যায় প্রবীণত্ব লাভ করিয়াছে। তজ্জন্য আমি ইহাকে সহস্রসেনার অধিনায়কপদে অভিষিক্ত করিলাম। আপনারা বোধ হয় সকলেই এই নিয়োগে সন্তোষ লাভ করিবেন।"

রাজার বাক্য শেষ হইবামাত্র পৌর ও জানপদবর্গ সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "রাজন্! উপযুক্ত পাত্রেই উপযুক্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হইল। আপনি ন্যায়াধীশ—আপনার কার্য্য সম্পূর্ণ ন্যায্যই হইয়াছে। বীরপুঙ্গব যুবকের সেনাপতিত্ব লাভে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই পরম সন্তুষ্ট হইয়াছে জানিবেন।"

তদনন্তর রাজসভা ভঙ্গ হইল। সকলেই অহর্ব্বলের বীরত্ব, ধীরত্ব ও সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। অহর্ব্বল রাজার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।



পার্ব্বত্য দস্যুগণের সহিত অহর্ব্বলের যুদ্ধ।

ক্রমশঃ অহর্ব্বল রাজ্যমধ্যে একজন প্রধান লোক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। রাজ্যশাসনসম্বন্ধে তিনি এরূপ সুব্যবস্থা করিলেন যে রাজা কালিদাসের রাজ্য অচিরে সুখসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। অভাব রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া দূরে পলায়ন করিল।

রাজ্যের উপকণ্ঠে পর্ব্বতাকীর্ণ বনপ্রদেশে এক অসভ্য পার্ব্বত্য জাতি বাস করিত। ঐ অসভ্য বর্ব্বরগণ মধ্যে মধ্যে রাজা কালিদাসের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রজাগণের গৃহদাহ, ধন-বস্ত্রলুণ্ঠন প্রভৃতি অত্যাচার করিত। রাজা অনেকবার তাহাদিগকে এরূপ কুকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন এবং দুই এক জন দলপতিকে বন্দী করিয়াও রাখিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ব্বৃত্তগণ কিছুতেই লুণ্ঠন কার্য্য হইতে বিরত হয় নাই। সুবিধা পাইলেই তাহারা হঠাৎ রাজ্যমধ্যে পতিত হইয়া প্রজাগণের যাহা কিছু পাইত লইয়া প্রস্থান করিত।

তাহাদের এইরূপ অত্যাচারে রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বন-প্রদেশ করায়ত্ত করিতে মনস্থ করিলেন। রাজা বৃদ্ধ সেনাপতির নিকট স্বীয় মন্তব্য জ্ঞাপন করিলে, সেনাপতি বলিলেন, "রাজন্! এই অসভ্যগণ দুর্গমঅরণ্যপূর্ণ পর্ব্বতগুহায় বাস করে, ঐ স্থানের পথ ঘাট আমাদের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। অতএব যুদ্ধ করিয়া ইহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে ইহাদের অত্যাচারনিবারণার্থ রাজ্যসীমান্তে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রশস্ত উপায় আমি দেখিতে পাই না। রাজা সেনাপতির বাক্যে সন্তুষ্ট না হইয়া বীরবর অহর্ব্বলকে আহ্বান করিলেন। অহর্ব্বল রাজসকাশে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অহর্ব্বল অধুনা বঙ্গদেশে তুমি একজন অদ্বিতীয় বীর পুরুষ। তোমার সমরকৌশল অতীব প্রশংসনীয়। আমার ইচ্ছা তোমায় প্রধান সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করি।"

অহর্ব্বল বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "মহারাজ, আমি জানি আমার উপর আপনার যথেষ্ট দয়া আছে। ইহাই আমার অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। প্রধান সেনাপতি মহাশয় সর্ব্ববিষয়ে আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অধিকন্তু তিনি আমার পূজনীয় শিক্ষক। তিনি বর্ত্তমানে আপনি যদি আমাকে প্রধানসেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা হইলে তিনি অতিশয় মর্ম্মাহত হইবেন এবং আমারও প্রাণে অত্যন্ত কষ্ট হইবে। আমি ত আপনার

চিরানুগত ভৃত্য। যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন, তখনই সানন্দে নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া তাহা প্রতিপালন করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব।”

অহর্ব্বলের বিনয় পূর্ণ বাক্যে, রাজা অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “বীরবর! তুমি আমার রাজ্যের অলঙ্কার। তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত। তুমি অসামান্য পরাক্রমশালী হইয়াও নিরতিশয় বিনীত। যাহা হউক তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

এক্ষণে কিজন্য তোমাকে আহ্বান করিয়াছি শ্রবণ কর। আমার রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে যে সকল দুর্ব্বৃত্ত, অসভ্য, বন্যজাতি বাস করে তাহারা প্রায়ই আমার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত অত্যাচার করে, তাহা তুমি সবিশেষ অবগত আছ।

অতএব ঐ বনপ্রদেশ করায়ত্ত করিবার জন্য প্রধান-সেনাপতিকে বন্যজাতিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে অনুমতি করি। পার্ব্বত্য দস্যুগণকে দমন করিয়া তাহাদের বাসভূমি অধিকার করা প্রধান সেনাপতির ক্ষমতার অতীত। তিনি বলেন পর্ব্বতাকীর্ণ অপরিজ্ঞাত অরণ্যময় স্থান দুর্ব্বৃত্তগণের হস্তচ্যুত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু ঐ স্থান রাজ্যভুক্ত করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। সেই জন্য অনুমতি করিতেছি তুমি সসৈন্যে পার্ব্বত্য ভূমিতে গমন করিয়া অচিরে অসভ্যগণকে দমন করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।”

রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া অহর্ব্বল নম্রভাবে বলিলেন, "রাজন্! আমি শীঘ্রই পার্ব্বত্য দস্যুগণকে দমন করিয়া তাহাদের বাসভূমি আপনার রাজ্যান্তর্গত করিয়া দিব। ইহার জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না। অসভ্যগণ রণকৌশলে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহারা আমার সুশিক্ষিত সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবে না। আমার অধীনে যে সকল সৈন্য আছে, আমি তাহাদিগকে লইয়া কল্য প্রাতঃকালে যুদ্ধযাত্রা করিব।" এই বলিয়া অহর্ব্বল রাজপদে প্রণত হইলেন। রাজা অহর্ব্বলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।



অহর্ব্বলের যুদ্ধজয়।

অহর্ব্বল সুশিক্ষিত সহস্র সৈন্য লইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজ্যসীমান্তে উপস্থিত হইয়া তিনি সৈনগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক ভাগ সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সৈন্যদল তিনি স্বয়ং পরিচালন করিতে লাগিলেন। এক ভাগ উত্তর দিক বেষ্টন করিয়া ও অন্য ভাগ দক্ষিণ দিক দিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে সমস্ত বনপ্রদেশ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল। উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সৈন্যগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া অসভ্যগণের বাসভূমি আক্রমণ করিল। বন্যগণ কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া রণে ভঙ্গ দিল। সম্মুখ ভাগ অনাক্রান্ত দেখিয়া তাহারা সেই দিকেই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রাজসৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাৎ ও পার্শ্বদেশ বেষ্টন করিয়া ধাবিত হইল। অসভ্যগণ সম্মুখে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে অহর্ব্বলের সৈন্যগণ তাহাদিগকে বাধা দিল। এইরূপে বন্যদস্যুগণ চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র সুশিক্ষিত সৈন্যগণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। পরে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা পুনরায় মহোৎসাহে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অহর্ব্বলের শিক্ষিত সৈন্যগণ চর্ম্ম-সাহায্যে তাহাদের তীরনিক্ষেপ ব্যর্থ করিয়া তরবারির দ্বারা

তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিল। এইরূপে বহুসংখ্যক অসভ্য নিহত হইলে, তাহারা ভীত হইয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিল। অহর্ব্বল দলপতিগণকে বন্দী করিলেন এবং বিজিত স্থান সুশাসনে রাখিবার জন্য পঞ্চ শত সৈন্য ও একজন সেনাপতিকে সেই স্থানে রাখিয়া দিলেন এবং দলপতিগণকে সঙ্গে করিয়া রাজসকাশে উপনীত হইলেন। রাজা বিজয়-সংবাদে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া অহর্ব্বলকে বহুমূল্য উপহার প্রদান করিলেন। রাজ্যমধ্যে মহোৎসব হইতে লাগিল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অহর্ব্বলের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

—*—

অহর্ব্বল কালিদাসের রাজ্য ত্যাগ করিলেন।

রাজা কালিদাসের এক সুন্দরী অবিবাহিতা কন্যা ছিল। অহর্ব্বলের রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া কিশোরী রাজকন্যা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষিণী হন। রাণী ক্রমশঃ কন্যার অভিপ্রায় জানিতে পারেন। কিন্তু অহর্ব্বল পিতৃমাতৃহীন, গৃহশূন্য যুবক। তাঁহার সহিত রাজকন্যার বিবাহ দিতে রাজা স্বীকৃত হইবেন কিনা এই সন্দেহে তিনি রাজার নিকট এই বিবাহপ্রস্তাব উত্থাপন করিতে সাহস করেন নাই। সর্ব্বগুণসম্পন্ন অহর্ব্বলের হস্তে রূপবতী কন্যা অর্পণ কবিতে রাণীরও অত্যধিক বাসনা ছিল। বাজার নিকট স্বীয় বাসনা জ্ঞাপন করিতে তিনি অবসর প্রতীক্ষা কবিতেছিলেন। এক্ষণে সেই সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। অহর্ব্বল পার্ব্বত্যদস্যুগণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ কবিলে রাজা তাঁহার উপব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি অহর্ব্বলের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে নিজরাজ্যে বাস করাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।

রাণী বাজার এই বাসনা অবগত হইয়া তাঁহাকে একদিন বলিলেন, "স্বামিন্! আপনি অহর্ব্বলের বিবাহের জন্য উপযুক্ত কন্যা অনুসন্ধান করিতেছেন। অহর্ব্বল সর্ব্বগুণের আধার এবং রাজ্যের পরম হিতৈষী। এইরূপ সুপাত্রে আমাদের কন্যা অর্পণ করিলে কি কিছু দোষ হইতে পারে? আমার ইচ্ছা অহর্ব্বলের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হয়।

এই কথা বলিয়া রাণী তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে রাজা গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "রাজ্ঞি, অহর্ব্বলের ন্যায় সুপাত্রে কন্যাদান করিতে কাহার না অভিলাষ হয়? আমিও এ বিষয় বহুদিন হইতে চিন্তা করিতেছি। কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীল যুবক অহর্ব্বলের হস্তে কন্যাদান করা আমার পক্ষে অত্যন্ত অপমান-জনক। রাজকন্যার বিবাহ রাজপুত্রেরই সহিত হওয়া উচিত।"

রাজার বাক্যে রাণী অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, "গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি অহর্ব্বল রাজপুত্র; অতি শৈশবে কোন অভাবনীয় দুর্ঘটনাবশে শিশু গুরুদেবের আশ্রয়ে আনীত হয়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নিকট আরও শুনিয়াছি যে বালক স্বীয় ভুজবলে সুবিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইবে। তবে অহর্ব্বলকে কন্যাদান করিতে দোষ কি?

রাজা বলিলেন, "সবই সত্য। কিন্তু অন্য কেহই অহর্ব্বলকে রাজপুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না। অতএব ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে এই কার্য্য হইতে বিরত হইতে হইতেছে। আর এক বিপদের কথা—অহর্ব্বলের বিবাহ অভিপ্রায় জানিবার জন্য মন্ত্রীকে তাহার নিকট পাঠাইলে যুবক বলিয়াছে যে সে রাজকন্যা ভিন্ন অন্য কোন কন্যা বিবাহ করিতে স্বীকৃত নহে: এবং ক্রমশঃ অনুসন্ধানে জানিতে পারিতেছি, কন্যাও নাকি যুবক অহর্ব্বলের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে আমি উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি। স্বীয় কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিতেও পারিতেছি না এবং তাহাকে কন্যাদান করিব না, এ কথাও তাহাকে বলিতে

পারিতেছি না। ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইবে। এই কথা বলিয়া রাজা বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন।

রাজকন্যা অহর্ব্বলের উপর এতদূর আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি দূতী দ্বারা স্বীয় অভিলাষ যুবককে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। যুবকও রাজকন্যাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে যদি এই বিবাহে রাজার অসম্মতি না থাকে তবে তিনি রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছেন কিন্তু রাজার অসম্মতি থাকিলে প্রাণান্তেও বিবাহকার্য্যে স্বীকৃত নহেন। কারণ রাজা তাঁহার আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক পিতা। রাজার আশীর্ব্বাদেই তিনি আজ ভারতে একজন বীরপুরুষরূপে গণ্য। কিছুতেই তিনি এই মহোপকারী জনের অসন্তোষ উৎপন্ন করিয়া নিরয়গামী হইতে পারিবেন না।"

অহর্ব্বল রাজার অসম্মতিক্রমে রাজকন্যাকে বিবাহ করিবেন না—মনে মনে এরূপ স্থির করিলেও তাঁহার প্রাণ রাজার সম্মতি গ্রহণের অপেক্ষা না করিয়া অজ্ঞাতসারে রাজকন্যার প্রাণে যাইয়া মিশিয়াছিল। তিনি আশা করিয়াছিলেন রাজা যখন তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, তখন বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইলেই তিনি তাঁহাকে কন্যাদান করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না। কিন্তু অহর্ব্বল যখন শুনিলেন যে ইচ্ছা-সত্ত্বেও রাজা তাঁহাকে কন্যাদান করিতে পারেন না, তখনই তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভের সহিত রাজা কালিদাসের রাজ্য ত্যাগ করিলেন।

---*---

অহর্ব্বলের বায়ড়া গমন।

একদিন নিশীথকালে অহর্ব্বল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বেগবান্ তুরঙ্গমে আরোহণ করতঃ রাজা কালিদাসের রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার প্রাণ ঔদাসীন্যপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি কখনও সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ভগবান-লাভের আশায় সাধন-মার্গের পথিক হইতে প্রয়াসী হইলেন. কখনও বা রাজকন্যাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সংসারী হইতে ইচ্ছুক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়া পড়িল। অবশেষে তিনি কালিদাসের উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার কন্যার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন।

তিনি শূন্যপ্রাণে, শূন্যমনে কিয়দ্দূর পূর্ব্বাভিমুখে চলিলেন। পরে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমন করিবার উদ্দেশে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতিদিন পথমধ্যস্থ পান্থনিবাসে প্রাণধারণোপ-যোগী যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যগ্রহণ ও দুই তিন ঘণ্টা মাত্র বিশ্রাম করিয়া অশ্বারোহণে দিবারাত্র চলিতে লাগিলেন।

চতুর্থ দিবস মধ্যাহ্নকালে তাঁহার ঘোটক অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া ভূপতিত হইল। অহর্ব্বল অশ্বকে বাঁচাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অশ্ববর আর ভূমি-

শয্যা ত্যাগ করিল না। অনন্তর অহর্ব্বল ক্লান্তদেহে ও বিষণ্ণ মনে পদব্রজেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন সম্মুখে এক সুবিস্তীর্ণ অরণ্য। তিনি বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন এক কুমুদকহ্লারসুশোভিত সরোবর। অহর্ব্বল সরোবর-তীরে উপবেশন করিলেন। সেদিন তখনও তিনি জলগ্রহণ করেন নাই। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন; এবং একমাত্র দোসর অশ্বের মৃত্যুতে প্রাণ অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত। অহর্ব্বলের প্রাণ নানা চিন্তাতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। একবার তিনি মনে করিলেন, "রাজা কালিদাসের নিকট ফিরিয়া যাই। সেখানে ত বেশ ছিলাম। রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আমায় ভালবাসিত। সেখানে আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। রাজ্যমধ্যে আমি একজন প্রধান লোক ছিলাম।" আবার ভাবিলেন, "না, সেখানে আর ফিরিব না। সেখানে যাইলেই রাজকন্যার জন্য মন আবার ব্যাকুল হইবে। অজ্ঞাতকুলশীল পিতৃমাতৃহীন হতভাগ্য আমি। আমি বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে আর যত্ন করিব না।"

এইবার তাঁহার পালনকর্ত্রী স্নেহময়ী মাতার কথা মনে পড়িল। আকর্ণবিশ্রান্ত আরক্তিম চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুজলে ভরিয়া গেল। অহর্ব্বল শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া হতাশপ্রাণে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "আমি এতদূর দুরদৃষ্ট যে জনক-জননী কেমন তাহা জীবনে কখনও দেখি নাই। জনক-জননীর স্নেহ পাওয়া দূরে থাক্, কোন দৈবদুর্ঘটনায়, ভূমিষ্ঠ

হইবার কিছুক্ষণ পরেই, তাঁহাদের স্নেহময় ক্রোড় হইতে চির-কালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। যে দেবী এই অসহায় অবস্থায় আমাকে রক্ষা করিয়া অতিশয় যত্ন ও আদরের সহিত লালন-পালন করিয়াছিলেন এবং যে দেবসদৃশ মহাপুরুষ বিদ্যার আলোকে আমার হৃদয়ান্ধকার দূরীভূত করিয়া যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষার জন্য রাজা কালিদাসের নিকটে রাখিয়া আসিয়াছিলেন—সেই দেব, দেবী—সেই পিতা, মাতা—আমার দগ্ধজীবনের একমাত্র শান্তির উৎস—হায়! এখন তাঁহারা কোথায়? যে দেব-দেবী গঙ্গাতটনিকটবর্ত্তী পবিত্র আশ্রমে এই হতভাগ্যকে কতই যত্নে লালন-পালন করিয়াছিলেন—তাঁহারা আজ কোথায়? প্রাণ আমার, সেই স্বর্গাপেক্ষা সুখকর পবিত্র আশ্রমে ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে—সেই স্বর্গের দেবদেবীর নিকটে গমন করিয়া তাঁহাদের সুধাময় স্নেহবাণী শ্রবণ করিতে প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হায়! এই দুর্ভাগ্যের কপালদোষে তাঁহারাও আজ নিরুদ্দেশ। আমি তাঁহাদের সংসারের বন্ধনস্বরূপ ছিলাম। তাই তাঁহারা আমাকে স্থানান্তরিত করিয়া চিরকালের জন্য আমার নয়নের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন।"

এখন পৃথিবীতে আমার বলিতে আর কেহ নাই। যেদিকে চাহিয়া দেখি, সেই দিকই ঘোরঅন্ধকারাচ্ছন্ন। হায়! যে হতভাগ্য এই পৃথিবীতে কাহারও নিকট একবিন্দু ভালবাসা পাইবার পাত্র নহে, এই সুবিস্তীর্ণ ধরাধামে যে দুরদৃষ্টের আপনার বলিতে কেহ নাই, মহাদুঃখানলে দগ্ধ হইলেও একবিন্দু শান্তি-

বারি যাহার পক্ষে দুর্লভ—সেই নরাধমের ঘৃণিতজীবনধারণের আবশ্যকতা কি ?"

অহর্ব্বল আবার ভাবিতে লাগিলেন, "ব্রহ্মচারী পিতা বলিয়াছেন—এই পৃথিবী পরীক্ষাস্থল। কাঞ্চন যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ হয়, তদ্রূপ মানব নানা দুঃখকষ্টে পতিত হইয়া সেই অনাথশরণ, ভূতভাবন ভগবানের কৃপালাভ করিবার উপযুক্ত হয়। মানবজীবন দুর্লভ। এই দুর্লভ মানবজীবন লাভ করিয়া ভগবানলাভই মানুষের মুখ্য উদ্দেশ্য।



এক শক্তি-সাধকের সহিত অহর্ব্বলের সাক্ষাৎ।

মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গিয়াছে। অহর্ব্বল তখনও একবিন্দু জল মুখে দেন নাই। তিনি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং সরোবরের পবিত্রনীরে অবগাহন করিয়া দেহের সন্তাপ দূর করিলেন। তদনন্তর ক্ষুন্নিবারণার্থ ফলমূল অন্বেষণের জন্য গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

বনবৃক্ষজাত কয়েকটী সুপক্ক ফল ভক্ষণ করিয়া তিনি বনমধ্যে শূন্যমনে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে কিয়দ্দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, এক পর্ণকুটীর দ্বারে পরিহিতরক্তবস্ত্র, জটাজুটধারী, রুদ্রাক্ষশোভিতকণ্ঠ একজন শক্তি-সাধক ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি উপবিষ্ট।

অহর্ব্বল কৌতূহলনিবারণার্থ সেই দিকে গমন করিলেন এবং মহাপুরুষের নিকটবর্ত্তী হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন।

সাধক তাঁহাকে গুরুগম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কে? কি জন্য এই বিজন অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছ? অহর্ব্বল উত্তর করিলেন, "মহাত্মন্! আমি কে তা জানি না—জনক-জননীকেও আমি অবগত নহি। কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে সদ্যঃ-প্রসূত শিশু পিতামাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক ব্রহ্ম-চারীর আশ্রমে পালিত হই। ইহা ব্যতীত আমি আর আত্ম-

পরিচয় জানি না। আমি উদ্দেশ্যবিহীনভাবে পথে পথে ভ্রমণ করিতে করিতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ফলান্বেষণে এই বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি।”

সাধক সস্নেহে অহর্ব্বলকে বসিতে বলিলেন এবং কুটীর হইতে কিছু খাদ্য আনিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে দিলেন। অহর্ব্বল সাধকের আদেশক্রমে উপবেশন করিলেন এবং তদ্দত্ত আহার্য্য উদরসাৎ করিয়া যেন দেহে নূতন শক্তি পাইলেন। অনন্তর অহর্ব্বল তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহার উপদেশ অনুসারে শক্তি-সাধনা করিবেন এই অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, সাধক অতিশয় আনন্দের সহিত তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন।

---*---



অহর্ব্বলের শবদেহলাভ ;

অহর্ব্বল মহোৎসাহে তন্ত্রোক্ত সাধনকার্য্যে ব্রতী হইলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই নানা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি একজন মহাশক্তিশালী পুরুষ হইয়া উঠিলেন। সুবর্ণসুন্দরতনু অহর্ব্বল ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করতঃ কেশপাশ উন্মুক্ত করিয়া, সিন্দুরাঙ্কিতভালে, মহাশূলহস্তে যখন বনপ্রদেশে বিচরণ করিতেন, তখন বোধ হইত যেন কৈলাসপতি পৃথিবীর পাপ-তাপ দূর করিয়া, আহার-নিদ্রা মৈথুনাসক্ত বদ্ধজীবের মায়াপাশ ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

একদিন ত্রিশূলপাণি অহর্ব্বল বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন এক ভীষণ শার্দ্দূল একটী মনুষ্যকে সুতীক্ষ্ণ কবাল-দন্তের দ্বারা ধারণ করিয়া অতি বেগে ধাবমান হইতেছে। অহর্ব্বল এই দৃশ্য দেখিবামাত্র হতভাগ্য মনুষ্যটীকে ব্যাঘ্রকবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিদ্যুৎবেগে সেই নরশোণিতলোলুপ ভীষণ পশুর পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে অহর্ব্বল ব্যাঘ্রের নিকটস্থ হইয়া হস্তস্থিত মহাশূল তাহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। শূল মহাবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া ব্যাঘ্রের কুক্ষি বিদারণ করিল। বিকট চীৎকার করিয়া বন্যপশু পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

অহর্ব্বল ব্যাঘ্রাহত মনুষ্যটীকে রক্ষা করিবার জন্য অতি দ্রুত

পদবিক্ষেপে শার্দ্দূলসমীপে উপস্থিত হইলেন। অতি যত্নের সহিত রক্তাক্তকলেবর ভূপতিত মনুষ্যটীকে উত্তোলন করিয়া দেখিলেন যে বহুক্ষণ তাহার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এই শোচনীয় ব্যাপারে অহর্ব্বল অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন এবং মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া সাধকবরের কুটীরে উপস্থিত হইলেন।

শক্তিসাধক মহাপুরুষ অহর্ব্বলের স্কন্ধদেশে এক রুধিরাক্ত মৃত-দেহ দর্শন করিয়া অতিমাত্র বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, ব্যাপার কি? এই শবদেহ তুমি কোথায় কিরূপে প্রাপ্ত হইলে? দেখিয়া বোধ হইতেছে ইহা সদ্যমৃত কোন হতভাগ্যের দেহ।" সাধকের বাক্য শেষ হইলে, অহর্ব্বল বলিলেন, "প্রভো! একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র এই হতভাগ্যকে লইয়া পলায়ন করিতেছিল। আমি কিয়দ্দূর হইতে এই ব্যাপার দর্শন করিয়া লোকটীকে শার্দ্দূল-কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সুতীক্ষ্ণশূলহস্তে সবেগে উহার পশ্চাদ্ধাবমান্ হইলাম। কিছুক্ষণ পরেই নররুধিরপিপাসু ভয়ঙ্কর পশুর নিকটবর্ত্তী হইয়া হস্তস্থিত মহাশূল নিক্ষেপে উহার কুক্ষি বিদীর্ণ করিলাম। ভীষণ চীৎকার করিয়া ব্যাঘ্র ভূতলশায়ী হইল। তৎপরে ব্যস্তভাবে আহত ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া দেখিলাম যে হতভাগ্য ইহলীলা সংবরণ করিয়াছে। আর ক্ষণ-কাল বিলম্ব না করিয়া শোণিতসিক্তশরীর স্কন্ধে স্থাপন করতঃ আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই সম্পাদন করিব।

সাধক বলিলেন, "অপঘাতে মৃত এই ব্যক্তির দেহ সযত্নে রক্ষা কর। এরূপ শব অনায়াসলভ্য নহে। বোধ হয়, মহামায়া আমাদের উপর সুপ্রসন্না। তাঁহা না হইলে, এই অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিবে কেন? বৎস! তোমার এই কার্য্যে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

সাধকের বাক্য শ্রবণ করিয়া অহর্ব্বল অতিশয় আশ্চর্য্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব! আপনার কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না। একজন লোক ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইল; তাহার জন্য দুঃখপ্রকাশ না করিয়া আপনি তাহার মৃতদেহ দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন—আপনার এইরূপ মমতাশূন্য ব্যবহারে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি।"

সাধক সহাস্যবদনে বলিলেন, "বৎস! তুমি কি শব-সাধনার কথা কখনও শ্রবণ কর নাই? শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে মনুষ্য দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। মহাশক্তিরূপিণী জগজ্জননী করালিনী কালী সিদ্ধব্যক্তিকে বরাভয়দানে কৃতার্থ করেন। তখন আর কোন কার্য্যই সেই সিদ্ধপুরুষের অসাধ্য থাকে না। তখন মানব ত তুচ্ছ, দেব, দানব, যক্ষ রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি সকলেই তাঁহার অমিতশক্তির সম্মুখে মস্তক অবনত করে। সেই ক্ষণজন্মা পুরুষ এই ধরাধামে শিবতুল্য শক্তিমান্ হইয়া জগতের মহোপকার সাধন করতঃ দেহান্তে মহাশক্তিতে লীন হন। এই মৃতদেহ শবসাধনার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া আমি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আজ আমাদের বড়ই শুভদিন।

তাহা না হইলে এত সহজে এই দুর্লভ বস্তুর সংযোগ হইবে কেন। এক্ষণে সাধনার সর্ব্বপ্রধান উপকরণ এই শব, অতি সাবধানে রক্ষা কর।"

শবসাধনায় সিদ্ধ হইলে মানব শিবত্ব লাভ করে শ্রবণ করিয়া অহর্ব্বল নিরাপদ স্থানে মৃতদেহ অতি সযত্নে রক্ষা করিলেন এবং স্বয়ং ঐ সাধনায় ব্রতী হইতে অতিশয় আগ্রহান্বিত হইলেন। অনন্তর গুরুদেবের নিকট অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব! মৃতদেহ ত রক্ষিত হইল। কোন্ সময়ে ও কি প্রকারে শবসাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয় বলিয়া এ দাসের উৎকণ্ঠা দূর করুন।"

অহর্ব্বলের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া গুরুদেব বলিতে লাগিলেন, "আগামী অমাবস্যার দিন মহানিশায় নির্জ্জন মহাশ্মশানে অপঘাতে মৃত এই শবদেহের হস্ত, পদ মৃত্তিকা-প্রোথিত বিল্বদণ্ডে আবদ্ধ করিয়া উহার পৃষ্ঠদেশে পদ্মাসনে উপবেশন করতঃ মহাশক্তির আরাধনা করিতে হয়। সাধককে সাধনভ্রষ্ট করিবার জন্য দেবগণ নানাপ্রকার বিভীষিকা ও প্রলোভন প্রদর্শন করেন। তাহাতেও অটলভাবে যে মহাপুরুষ মহাশক্তির উপাসনায় তন্ময়-চিত্তে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নিযুক্ত থাকিতে পারে, তাঁহাকেই ত্রিলোকজননী বরদানে পূর্ণমনোরথ করেন। অদ্য হইতে তুমি আমার নিকট শবসাধনার প্রক্রিয়া ও নিয়মাবলী শিক্ষা কর।"

গুরুর এই সদয়-বাক্য শ্রবণ করিয়া অহর্ব্বল অতি যত্নের সহিত সাধনার নিয়মাবলী শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

---*---

অহর্ব্বলের শব-সাধনা।

আজ অমাবস্যার রজনী। ঘোর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন। নিবিড় মেঘমালা অম্বর আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। সেই করাল ছায়া পৃথিবীতে পতিত হইয়া অন্ধকারকে ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কড-কড়-নাদে কুলিশধ্বনি মহাবীরের হৃদয়েও আতঙ্ক সঞ্চার করিতেছে। চঞ্চলা চপলা ক্ষণেকের জন্য মানবের চক্ষু ঝলসিত করিয়া অন্ধকারের ভীষণত্ব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতেছে। প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে যেন করালবদনা কালী উন্মুক্তকৃষ্ণকেশপাশে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতে করিতে দানবহৃদয়ে ত্রাসোৎপত্তির জন্য ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিতেছেন। মহাকালী যেন কালের বক্ষে পদাঘাত করিয়া ব্যোমপথে ধরাধামে অবতীর্ণ হইতেছেন।

জগৎ নিস্তব্ধ। যেন মহামায়ার মায়া-ঘোরে অচৈতন্য। কেবল শিবাগণ মহাশিবার আগমন জ্ঞাপন করিবার জন্যই যেন মহোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। মায়াপাশবদ্ধ মানব আজ মহাভয়ে ভীত হইয়া শয্যার মধ্যে লুক্কায়িত। মায়ের এই ভয়ঙ্করী মনোহারিণী মূর্ত্তি দেখিবার শক্তি তাহাদের নাই।

কে বীর ভক্ত আছ, একবার গৃহের বাহির হইয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া মায়ের মায়ামোহধ্বংসকারী অপরূপ রূপ দেখিয়া

জীবন সার্থক কর। এস, এস—মাতার প্রিয় পুত্রগণ,—মা আসিতেছেন—দেখিবে এস। এমন রূপ কখনও দেখ নাই—এমন ভীষণত্বের সহিত সৌন্দর্য্যের সংমিশ্রণ কখনও দেখ নাই, এমন গাম্ভীর্য্যের সহিত মাধুর্য্যের মিলন কখনও নয়নগোচর কর নাই—এমন দুষ্টইন্দ্রিয়প্রমথনকারী ভয়ঙ্করী রূপমাধুরী কখনও ভোগ কর নাই। এস, মায়ের বীর, সাহসী, শুচি পুত্রগণ! এস, নয়ন ভরিয়া একবার মায়ের কালভয়বারণ কালরূপ দেখিয়া লও। তোমাদের প্রাণ, মন বিভোর হইয়া যাইবে! তোমাদের হৃদয় আকাশের ন্যায় উন্মুক্ত হইয়া যাইবে! তোমাদের দেহে মহাশক্তির সঞ্চার হইবে। তোমাদের মানবজন্ম সার্থক হইবে।

মায়ের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইও না। ভাল করিয়া মনোযোগের সহিত দেখ দেখি, ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির অন্তরালে মায়ের করুণাময়ী মূর্ত্তি বিরাজমানা! দেখ, দেখ, মায়ের খড়্গের রুধির ধারার দিকে চাহিয়া দেখ—দেখ, ভাল করিয়া দেখ—অসির পশ্চাৎ দিক দিয়া প্রেমের অনন্ত ধারা প্রবাহিতা! দেখ, দেখ, মায়ের লোল রসনার দিকে একবার চাহিয়া দেখ—এখনই তোমার হৃদয়কন্দরের লুক্কায়িত সকল বাসনা ভয়ে দূরে পলায়ন করিবে। চল! চল! মায়ের সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া দেখ—মা ঘোর শ্মশানে অবতীর্ণা হইতেছেন! দেখ! তোমার হৃদয়ের দিকে অন্তর্দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ—তোমার হৃদয়ও যে শ্মশান হইয়া গিয়াছে! দেখ! দেখ! তুমি এখন মায়াপাশমুক্ত। জীবত্ব ছাড়িয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। দেখ! দেখ! শ্মশানবাসিনী মুক্ত-

কেশী কেশপাশ মুক্ত করিয়া তোমার হৃদয়শ্মশানে নিরবধি নৃত্য করিতেছেন! তুমি শোক, তাপ ভুলিয়া গিয়াছ! তুমি জগৎ সংসার ভুলিয়া গিয়াছ! তুমি আত্ম-পর বিস্মৃত হইয়াছ! তুমি মহাপ্রেমে বিভোর হইয়া করালবদনার সুন্দর মুখের দিকে নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিয়াছ। এস, এস—আর বিলম্ব করিও না।

মায়ের বীর সন্তান অহর্ব্বল, তাঁহার গুরুদেবের সহিত মায়েব অপরূপ রূপ দেখিতে দেখিতে মহাশ্মশানের দিকে অগ্রসব হইতেছেন। অহর্ব্বলের বদনমণ্ডলে দিব্য-জ্যোতির তবঙ্গ খেলিতেছে। মহা উৎসাহের সহিত, কি যেন এক দিব্য বস্তু-প্রাপ্তির আশায় উন্মত্ত হইয়া অহর্ব্বল মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া শ্মশানের দিকে চলিয়াছে। অহর্ব্বল জগৎ ভুলিয়া গিয়াছে। কি যেন এক মহপ্রেমের বৈদ্যুতিক শক্তি তাঁহার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইতেছে।

অহর্ব্বল গুরুদেবের সহিত শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং চারিটি বিল্বদণ্ড মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া শবের হস্ত-পদ দৃঢরূপে তাহার সহিত আবদ্ধ করিলেন। তৎপরে সাধনাব সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়া তন্ময়চিত্তে মহাশক্তির ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন।

গুরুদেব অহর্ব্বলকে কিছু দূরে অবস্থান করিতে বলিয়া নিজে শবেব পৃষ্ঠদেশে পদ্মাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি নিয়ম-মত পূজাদি সমাপন করিয়া জপে নিযুক্ত হইলেন। জপ করিতে

করিতে তিনি ভাবিতেছিলেন শীঘ্রই সিদ্ধি তাঁহার করতলগত হইবে। এই চিন্তায় তাঁহার তন্ময়তা নষ্ট করিল। অহঙ্কার আসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। সেই ঘোর শ্মশানে তিনি নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে ভূতপ্রেতের ভীষণ হুম্‌হাম্ শব্দ যেন তাঁহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল, যেন কালান্তক ভৈরবগণ মহাশূল উত্তোলন করিয়া তাঁহার মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন করিতে আসিতেছে বলিয়া তাঁহার বোধ হইতে লাগিল! তিনি যেন দেখিতে লাগিলেন, সহস্র সহস্র বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে। তিনি মহাভয়ে ভীত হইয়া শবাসন পরিত্যাগ করিলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় বিকট চীৎকার করিয়া সেই স্থান হইতে পলায়ন করিলেন।

অহর্ব্বল এতক্ষণ তদ্গতপ্রাণে মহাশক্তির ধ্যান করিতেছিলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি জগজ্জননীর অভয়চরণযুগল মানসনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। অহর্ব্বল মহাভাবে বিভোর হইয়া ভূমানন্দে মগ্ন হইয়াছিলেন। এমন সময় হঠাৎ এক বিকট চীৎকার তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত করিলেন। কিন্তু ঘোর অন্ধকারে কিছুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন মহাসাহসী অহর্ব্বল গাত্রোত্থান করিয়া শবের দিকে অগ্রসর হইলেন। শবের নিকটবর্ত্তী হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি দেখিলেন গুরুদেব শবাসনে

উপবিষ্ট নাই। শিবাগণ শবের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; শব বিকট মুখব্যাদান করিয়া মস্তক উত্তোলিত করিতেছে!

অহর্ব্বল গুরুদেবের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "গুরুদেবের সাধনা কি পণ্ড হইল! তিনি কি ভয়প্রযুক্ত শবাসন পরিত্যাগ করিয়া এ স্থান ত্যাগ করিলেন! অথবা অন্য কোন কারণে তিনি স্থানান্তরে গমন করিলেন। যাহা হউক কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দেখা যাউক

এই ভাবিয়া অহর্ব্বল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। মহাশূল আস্ফালন করিয়া তিনি শিবাগণকে বিতাড়িত করিলেন। এই-রূপে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া নিজে শবাসনে উপবিষ্ট হইয়া সাধনা করিতে প্রয়াসী হইলেন। অনন্তর কালভয়বারিণীর অভয়চরণ স্মরণ করিয়া শবোপরি আরূঢ় হইলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল। তাঁহার প্রাণমন পরমাত্মায় লীন হইল। তাঁহার তপঃপ্রভাবে দেবগণ ভীত হইয়া তাঁহার সাধনা নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে নানা বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবীরসাধক অহর্ব্বল এখন তন্ময়। বিভীষিকায় আর তাঁহার কি করিবে? তিনি যোগানন্দে মগ্ন হইয়া বিশ্বেশ্বরীর অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছেন। অহর্ব্বলকে সাধনভ্রষ্ট করিতে দেবগণের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইলে অষ্টনায়িকা একে একে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা অহর্ব্বলকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন—অপরূপ রূপলাবণ্যে

দশদিক আলো করিয়া তাহারা অহর্ব্বলকে বলিতে লাগিলেন. "হে বীর সাধক, তোমার সাধনা পূর্ণ হইয়াছে। চল, এখন আমাদের সহিত স্বর্গরাজ্যে গমন করিয়া চিরানন্দে কালাতিপাত কর। আমাদের সঙ্গলাভে তুমি ধন্য হইবে।

কিন্তু অহর্ব্বল উত্তর করিলেন, "না, আমি আপনাদিগকে চাই না। আপনারা এস্থান হইতে প্রস্থান করুন। করুণাময়ী মা আমার, যতক্ষণ না এই অধম পুত্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, যতক্ষণ না মায়ের অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া জীবন সার্থক করি, ততক্ষণ আমি তাঁহার অমরবাঞ্ছিত চরণযুগল নিয়ত স্মরণ করিব।" এই বলিয়া অহর্ব্বল পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। এবার পুত্র-বৎসলা মাতা আর থাকিতে পারিলেন না। মহাশক্তিরূপিণী কালী তখন বরাভয়করে অহর্ব্বলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস! বর গ্রহণ কর। তোমার সাধনা পূর্ণ হইয়াছে।"

তখন অহর্ব্বল কৃতাঞ্জলিপুটে মহোল্লাসে বলিতে লাগিলেন, "মাগো! যদি অকৃতী সন্তানের উপর দয়া হইয়া থাকে, তবে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন মা! তোমার পাদপদ্ম কখনও ভুলিয়া না যাই। দুর্ব্বল পুত্রকে এই সংসার-কারাগার হইতে চিরতরে মুক্ত করিয়া দাও। আর যেন মায়াপাশে কখনও আবদ্ধ হইতে না হয়।

মহাভক্ত সাধক অহর্ব্বল এইরূপ প্রার্থনা করিলে, তাঁহার বোধ হইল যেন করুণাময়ী জগজ্জননী কালী সস্নেহ-বচনে বলিতেছেন, "বৎস! সম্পূর্ণরূপে মায়া-পাশ ছিন্ন হইলে তোমা দ্বারা কোনও

সাংসারিক কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে না ; এমন কি তুমি জড়-দেহ ধারণেই অসমর্থ হইবে ; তোমার আত্মা পরব্রহ্মে লীন হইবে। ভগবদিচ্ছায় তুমি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছ। ইহজীবনে তোমাকে অনেক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। সেই সকল মহা-দুরূহ-কার্য্যকরণোপযোগী মহাশক্তি স্বীয় সাধনা-বলে আজ তুমি লাভ করিয়াছ। এক্ষণে তোমার ন্যায় শক্তিমান্ পুরুষ বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় নাই। তুমি এই স্থানে রাজ্য স্থাপন কর এবং দারপরিগ্রহ করিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন কর। অনন্তর পার্থিব-লীলা শেষ করিয়া দেহান্তে মুক্তিলাভ করিবে।"

অহর্ব্বল মহাভাববিমুগ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "মা গো! তোমার অভয় চরণযুগলই আমার অমূল্যধন। অতি যত্নে ঐ দেবদুর্লভ রত্ন হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে রক্ষা করিয়াছি। কি অপরাধে, মা! হরি-হর-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত, ত্রিতাপ-ধ্বংসকারী সেই ধন কাড়িয়া লইয়া তৎপরিবর্ত্তে অসার রাজ্যধন দান করিতেছ! মা! আমি রাজ্য চাইনা, স্ত্রী-পুত্র কিছুই চাইনা—চাই কেবল তোর কালভয়বারণ চরণযুগল। মা গো! বহু সাধনায় এই অমূল্যধন লাভ করিয়াছি। চিরবাঞ্ছিত বহু-আয়াসলব্ধ এই ধন হইতে কাঙালকে বঞ্চিত করিস্ না। আনন্দময়ী মা আমার! তোর পাদাম্বুজমকরন্দপান করিয়া আমি ভূমানন্দে আত্মহারা হইয়া থাকিব—ইহাই আমার জীবনের একমাত্র বাসনা। মহাদুঃখজনক পার্থিব ধন দান করিয়া, মা গো! আর আমায় বিড়ম্বিত করিস্ না। যদি

এই অকৃতী পুত্রেব উপব প্রসন্ন হইযা থাকিস্, তাহা হইলে আমাব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কব্, নচেৎ এখনই তোবই সম্মুখে, তোব অভযচবণযুগল দেখিতে দেখিতে এই মহাশূলেব দ্বাবা বক্ষঃ বিদীর্ণ কবিযা জীবন পবিত্যাগ করিব।"

এই বলিযা অহর্ব্বল শূল গ্রহণ কবিযা যেমন হৃদযে বিদ্ধ কবিতে উদ্যত হইলেন, অমনি তাঁহার মনে হইল যেন অপাবককণাসাগবী মহাকালী তাঁহাকে নিষেধ কবিযা সস্নেহে বলিতেছেন, "বৎস অহর্ব্বল। অত অস্থিব হইতেছ কেন? তুমি রাজ্যলাভ কবিলেই কি আমি তোমায পবিত্যাগ কবিব। তুমি আমাব অতি প্রিয় ভক্ত। তোমায ছাড়িয়া আমি তিলার্দ্ধও থাকিতে পাবিব না। আমার শক্তি তোমাব দেহে নিযত বর্ত্তমান থাকিযা তোমাকে সকল কার্য্যে পবিচালিত কবিবে। ইহাতে তুমি সংসাবেব পরমমঙ্গল সাধন কবিবাব অবসব পাইবে। তুমি দুষ্টেব দমন, শিষ্টেব পালন ও ধর্ম্মবক্ষা কবিতে সমর্থ হইবে। এইরূপে জগতেব মহোপকাব সাধন কবিযা দেহাত্যযে পবম-পদ লাভ কবিবে। ইহা অপেক্ষা অধিকতব বাঞ্ছনীয আব কি হইতে পারে, অহর্ব্বল? কেবল মাত্র স্বীয আনন্দলাভেব আশা কি স্বার্থপবতা নহে?"

ভক্তবাঞ্ছাকল্পলতা মাতাব অপাবস্নেহযুক্ত কথা বুঝিতে পাবিযা অহর্ব্বলেব নযনদ্বয হইতে অনর্গল প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার দেহ মহাপ্রেমে বিহ্বল হইযা মায়ের চরণতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। অহর্ব্বল ভক্তিবিজড়িতস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"মা। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

অনন্তর ব্রহ্মরূপিণী অহর্ব্বলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি এক্ষণে রাজ্যস্থাপনে যত্নপর হও। তোমার সাধনাবলে তোমার বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য আমি যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলাম—তাহা এক্ষণে সংবরণ করি। কিন্তু তোমার হৃদয়মধ্যে আমি সর্ব্বদাই বিরাজমানা থাকিব।"

অহর্ব্বল বলিলেন, "মাগো! একটী বিষয় জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। আমার গুরুদেব প্রথমেহ শবাসনে উপবিষ্ট হইয়া সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমি কিয়দ্দূরে বসিয়া একান্তমনে তোমার চিন্তায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য ছিলাম। হঠাৎ এক বিকটচীৎকারে আমার ধ্যান ভঙ্গ হইল। আমার বাহ্যজ্ঞান আবার ফিরিয়া আসিলে, আমি ব্যস্তভাবে শবের নিকট যাইয়া দেখিলাম, গুরুদেব সেখানে নাই। শিবাগণ শবকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং শবও ভয়ঙ্কর মুখভঙ্গী করিতেছে। মা! গুরুদেব সিদ্ধিলাভ করিয়া কোথায় গমন করিলেন জানিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে।"

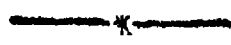
অহর্ব্বলের বাক্য শ্রবণ করিয়া জগন্মাতা সহাস্যবদনে কহিলেন, "বৎস! তোমার গুরুদেব সিদ্ধিলাভে অকৃতকার্য্য হইয়া উন্মত্ত অবস্থায় এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে। এ জীবনে আর সে কিছুই করিতে পারিবে না। পরজীবনে সে সিদ্ধিলাভ করিবে।

গুরুদেবের এই দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া অহর্ব্বল অতি বিষণ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাগো! সাধনভজনহীন অজ্ঞান

আমি, তোমার কৃপালাভ করিলাম ; আর সাধকশ্রেষ্ঠ মহাভক্তিমান্ পুরুষ তোমার করুণালাভে সমর্থ হইল না—এ প্রহেলিকা আমি ত কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না।"

অনন্তর জগদীশ্বরী অহর্ব্বলের কৌতূহল নিবারণার্থ বলিলেন, "বৎস! তোমার গুরুদেবের মনে অত্যন্ত অহঙ্কার ছিল। তিনি এতই বাসনাপরবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে আমার ধ্যান করিবার সময়ে একাগ্রচিত্ত না হইয়া ফললাভের চিন্তা তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মন চঞ্চল হইয়া পড়িলে, চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার বিভীষিকা তাহার নয়নগোচর হইতে লাগিল। অত্যধিক ভয়ে তাহার মস্তিষ্কের সমতা বিনষ্ট হইল এবং সে শবাসন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। বৎস! শবসাধনা অতিশয় কঠিন ব্যাপার, তদ্গতচিত্তে ধ্যান করিতে পারিলেই মহাসিদ্ধি করতলগত হয়, নচেৎ মহা অনর্থপাতে সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হয়।" এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

অহর্ব্বল যে স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন সেই স্থান বিক্রমপুর নামে পরিচিত।



অহর্ব্বলের রাজ্যস্থাপন।

অহর্ব্বল মহাসিদ্ধিলাভ করিয়া দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আশ্রয়দাতা সাধক অমাবস্যার রজনী হইতেই নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। অহর্ব্বল সেই সাধকের কুটীরেই বাস করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে সাধকের অনেক শিষ্য ও ভক্ত ছিল। তাহারা অহর্ব্বলকেও গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিল এবং তাঁহার একান্ত বাধ্য হইয়া পড়িল। তাহারা অহর্ব্বলের বাক্য বেদবাক্যের ন্যায় মান্য করিতে লাগিল।

একদিন অহর্ব্বল ভক্তগণকে সাধকের নিরুদ্দেশের কারণ বলিতে বলিতে কথাপ্রসঙ্গে শবসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কিরূপে জগন্মাতার বরলাভ করিয়াছিলেন, এবং মহেশ্বরী হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য তাঁহাকে সেই স্থানে রাজ্যস্থাপন করিতে কিরূপ আদেশ করিয়াছিলেন সেই সকল তাহাদিগের নিকট বর্ণন করিলেন।

ভক্তগণ অহর্ব্বলের সিদ্ধিলাভ ও বরপ্রাপ্তির কথা শ্রবণ করিয়া মহানন্দে সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "দেব! আপনি কালীর বরপুত্র। মহাশক্তি আপনার করতলগত। এই পৃথিবীতে আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি কাল বিলম্ব না করিয়া রাজ্যস্থাপনে সচেষ্ট হউন। আমরা যথাসাধ্য আপনার আদেশ পালন করিব।"

অহর্ব্বল তত্রত্য অধিবাসীবৃন্দের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "রাজ্যস্থাপন করিতে হইলে অর্থবল ও সৈন্যবল বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু সৈন্যসংগ্রহ করিতে পারিলে, অল্পায়াসেই অর্থলাভ হইতে পারে। যে সকল অসভ্য লোক বনপ্রদেশে বাস করিয়া শিকারাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিলে সহজেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে।"

অহর্ব্বলের বাক্যে সকলেই স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিল, "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে অতি সহজেই বহু সৈন্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু কে তাহাদিগকে রণকৌশল শিক্ষা দিবে? আমাদের মধ্যে কেহই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী নহে। আপনি মহাজ্ঞানী ও অদ্ভুত-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। আপনিই ইহার কোন সদুপায় স্থির করুন।"

তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া অহর্ব্বল বলিলেন, "যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না। আমি স্বয়ং যুদ্ধবিদ্যায় সুদক্ষ। রণকৌশল শিক্ষা দিবার ভার আমিই স্বহস্তে গ্রহণ করিব। তবে এই অসভ্যগণ অতি দুর্দ্দমনীয়। প্রথমতঃ ইহাদিগকে বাধ্য ও বশীভূত করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দলপতিগণ প্রায় প্রত্যেক হাটেই মধু, মৃগচর্ম্ম, হরিণশৃঙ্গ প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয় করিতে গ্রামমধ্যে আগমন করে। একদিন তোমরা সকলে তাহাদের সমস্ত দ্রব্য ক্রয় কর এবং

আমার আশ্রমে তাহাদের ভোজের আয়োজন করিয়া তাহাদিগকে আমার নিকট আনয়ন কর। তদনন্তর আমি তাহাদিগকে অতি সহজেই বশীভূত করিতে পারিব।

অহর্ব্বলের বাক্যে সম্মত হইয়া স্থানীয় ব্যক্তিগণ একদিন হাটে বন্যসর্দ্দারগণের সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিবার অভিলাষে তাহাদিগকে লইয়া অহর্ব্বলের আশ্রমে উপস্থিত হইল এবং তাহাদের দ্রব্যের বিনিময়ে যথোপযুক্ত অর্থ দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিল। অনন্তর নানাবিধ সুখাদ্য ভোজন করিয়া বন্যগণ পরম পরিতৃপ্ত হইল।

তাহারা উদরপূর্ণ করিয়া ভোজন করিলে পর অহর্ব্বলের ভক্তগণ তাহাদিগকে বুঝাইল যে এই মহাপুরুষ ঈশ্বরতুল্য শক্তিমান্। ইহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে কাহারও কিছুই অভাব থাকে না।

এই কথা শুনিয়া অসভ্যগণ অহর্ব্বলকে বেষ্টন করিয়া মহোল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিল এবং বলিল, আমরা যদি দিন এইরূপে খাইতে পাই তাহা হইলে তুই যাহা বলিবি আমরা তাহাই করিব। অহর্ব্বল অতি গম্ভীরভাবে তাহাদিগকে বলিলেন, "তোরা জঙ্গল কাটিয়া চাষ করিতে আরম্ভ কর্। কিরূপে চাষ করিতে হয়, আমি তোদের শিখাইয়া দিব। তাহা হইলে তোরা প্রতিদিনই এইরূপ খাইতে পাইবি। আর, তোরা আমার নিকট তলোয়ার, বর্ষা ও তীর চালাইতে শিক্ষা কর্। তাহা হইলে তোদের আর কোন অভাব থাকিবে না। তোরা বেশ ভাল করিয়া খাইতে পরিতে পাইবি।"

অহর্ব্বলের কথায় বিশ্বাস করিয়া অসভ্যগণ বন পরিষ্কার করিয়া কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিল এবং অহর্ব্বলের নিকট রণকৌশল শিক্ষা করিতে লাগিল। অতি অল্প দিনেই তাহারা যুদ্ধনিপুণ ও কৃষিকার্য্যে দক্ষ হইয়া উঠিল। তাহাদের খাদ্যের অভাব দূর হইল, তাহারা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বর্ষা ও শীতের কষ্ট হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল।

এইরূপে বহুসহস্র অসভ্য অহর্ব্বলের শিক্ষার গুণে অনেকটা সভ্য হইয়া উঠিল। তাহারা ক্রমশঃ বহুদূরবিস্তৃত অরণ্যপ্রদেশ পরিষ্কার করিয়া নানাপ্রকার শস্য উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত জনপদ শস্যসম্পদে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল।

অনন্তর অহর্ব্বল বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া স্বীয় রাজ্যে বাস করাইলেন এবং তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য নিস্কর ভূমিদান করিলেন। পণ্ডিতব্রাহ্মণগণ রাজ্যের নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বিদ্যার্থী ছাত্রগণ অধ্যয়নার্থ অহর্ব্বলের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল।

চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী জনপদ সমূহ হইতে কর্ম্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পীগণ 'বায়ড়া' রাজ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। কৃষকগণ অল্পকরে ভূমিলাভের আশায় দলে দলে আসিতে লাগিল। এইরূপে অতি অল্পকালের মধ্যেই অহর্ব্বলের রাজ্য ধনে, জনে পূর্ণ হইল।

এক্ষণে অহর্ব্বল কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ মনোযোগী

হইলেন। কথিত আছে, তিনি স্বয়ং অশ্বারোহণে রাজ্যমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া কৃষকগণের কার্য্য পরিদর্শন করিতেন এবং যে কৃষক কোন নূতন শস্য উৎপন্ন করিতে পারিত, তিনি তাহাকে নানা প্রকারে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিতেন। এইরূপে বায়ড়া জনপদের তাবৎ ভূমিই মনুষ্যের বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর প্রয়োজনীয় যাবতীয় শস্য উৎপাদনের উপযোগী হইয়া অচিরে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল।

রাজ্যমধ্যে এমন কোন লোকই রহিল না, যাঁহার ধান্যের গোলা, দুগ্ধবতী গাভী, কর্ষণোপযোগী বৃষ, মৎসপূর্ণ পুষ্করিণী, আম্র, কাঁটাল প্রভৃতি ফলবান্ বৃক্ষের অভাব ছিল। সকলেই দুগ্ধ, ঘৃত, ক্ষীর, সর, মৎস্য ও অন্নব্যঞ্জনাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিতে পাইয়া সুস্থ ও সবল দেহে প্রফুল্লমনে বাস করিতে লাগিল। দুঃখদৈন্য দেশ হইতে একেবারেই প্রস্থান করিয়াছিল। অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির বিষণ্ণ বদন স্বপ্নাতীত বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। আনন্দমূর্ত্তিনরনারীগণ বায়ড়া জনপদকে আনন্দ-রাজ্যে পরিণত করিয়াছিল।

রাজা অহর্ব্বল রাজ্যমধ্যস্থ প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবসেবার ভার এক একজন ধার্ম্মিক, আচারবান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। গ্রামবাসীজনগণ দিবসের কার্য্য শেষ করিয়া সন্ধ্যার সময় দেবালয়ে গমনপূর্ব্বক আরতি দর্শন ও ব্রাহ্মণের মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া অতি পবিত্র হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। ইহাতে সাধারণ প্রজাগণের

ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান যথেষ্ট হইত এবং তাহারা ঈশ্বরে পরমভক্তি-মান্ হইয়া দিনাতিপাত করিত। তাহাদের গৃহ নিত্য নবোৎসবে আনন্দপূর্ণ থাকিত।

হায়! আমাদের সেদিন কোথায় লুকাইল? আর বঙ্গ-বাসীর গৃহে গৃহে উৎসবের সে প্রাণভরা আনন্দ নাই। সে উৎসব এখন আমরা প্রায় একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছি। এখন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্গবাসীর গৃহে প্রতি সপ্তাহে, এমন কি প্রায় প্রতিদিনে পূর্ব্বের ন্যায় নানা পূজা পার্ব্বন একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের শিক্ষাভি-মানিনী রমণীগণও পূর্ব্বের কুসংস্কারাচ্ছন্না নারীগণের ন্যায় আর বড় একটা বার-ব্রতাদি করেন না।

তখন আমাদের আহার-বিহার পর্য্যন্তও উৎসবানন্দ পূর্ণ ছিল। তখন আমাদের দেশের অন্নপূর্ণারূপিণী ভক্তিমতী রমণীগণ অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃস্নান করিতেন। স্নান না করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে পারিতেন না। তদনন্তর অতি পবিত্রভাবে রন্ধনাদি সমাপন করিয়া মহানন্দে বাটীর সকলকে আহার করাইয়া বেলা তৃতীয় প্রহরে আহার করিতেন। এইরূপ দৈনন্দিন কার্য্য অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিতে তাঁহাদের কখনও বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইত না। দেব, দ্বিজে ভক্তিমতী হইয়া, নিত্যবারব্রত অতি সরলবিশ্বাসে, পবিত্রতার সহিত সম্পন্ন করিয়া—পতি, পুত্র প্রভৃতি সংসারস্থ সকলের পরিচর্য্যা করিয়া সুস্থশরীরে ও প্রফুল্লমনে তাঁহারা সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু হায়! অধুনা শিক্ষিতা, কুসংস্কারহীনা রমণীগণের অবস্থা, কিরূপ হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। আমরা তাঁহাদের অন্নপূর্ণার সাজ খুলিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে বিলাসিনীর সাজে সাজাইয়াছি। তাঁহাদের বারব্রতপূজাপার্ব্বন বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে অনেকটা ভক্তিশ্রদ্ধাহীনা করিয়া তুলিয়াছি। দুই তিনটীমাত্র সন্তান প্রসব করিয়াই তাঁহারা অকর্ম্মন্য হইয়া পড়িতেছেন। আমাদের গৃহস্থলী উৎসব ও আনন্দহীন হইয়া রোগ, শোক ও দুঃখের লীলাভূমি হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যতই বাটীর স্ত্রীলোকগণের পবিত্রহস্তে প্রস্তুত খাদ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া অন্যের প্রস্তুত খাদ্য ভক্ষণে প্রয়াসী হইতেছি, ততই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছি। আর কিছুকাল পরেই বোধ হয় আমাদের শিক্ষিতা রমণীগণ একেবারেই রন্ধন কার্য্যে অপটু হইয়া পড়িবেন। তখন আমাদিগকে হোটেলে খাইয়া জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইতে হইবে।

আমাদের জাতীয় অবনতির একটী প্রধান কারণ আমাদের আচার-ব্যবহারের এই অযথা পরিবর্ত্তন। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে আমরা আমাদের নিজস্ব ত্যাগ করিয়াই নিস্তেজ, অল্পায়ু ও নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছি। যাহাদের দেহ এত দুর্ব্বল, যাহাদের পরমায়ু এত অল্প, যাহাদের প্রাণ এত আনন্দশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা কিছুতেই আর উন্নতিশীল-জাতিমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

নবাবীসৈন্যের সহিত ভীষণ সংগ্রাম।

এক্ষণে অহর্ব্বল প্রাণপণচেষ্টা করিয়া প্রায় পঞ্চ সহস্র দৃঢকায়, বলবান ব্যক্তিকে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিলেন। এই সকল ব্যক্তি সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইলেও কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

এই নবপ্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র রাজ্যে প্রজাগণের ভরণ-পোষণের কিছু অভাব ছিল না বটে কিন্তু তাহাদের তখনও এরূপ সামর্থ্য হয় নাই যে তাহারা রাজাকে অর্থ সাহায্য করিয়া অন্যান্য রাজগণের ন্যায় তাঁহাকে বলবান্ করিতে পারে। দুর্গনির্ম্মাণ, পরিখা খনন ও অস্ত্রশস্ত্রসংগ্রহ প্রভৃতি নানবিধ অবশ্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি কার্য্যের জন্য অহর্ব্বলের অর্থের অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িল।

অর্থবলে বলীয়ান্ না হইলে তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত সুন্দর রাজ্য যে অচিরে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইবে এবং সেই আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি যে শীঘ্রই রাজ্যভ্রষ্ট হইবেন এই চিন্তায় তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন।

কথিত আছে অহর্ব্বল চিন্তাকুলচিত্তে একদিন অপরাহ্ণকালে রূপনারায়ণ নদের সৈকতভূমিতে পাদচারণা করিতেছিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই সূর্য্যদেব পশ্চিম গগণে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। বিহঙ্গকুল যেন কাতর ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল। পবন অহর্ব্বলের ক্লান্তি দূর করিবাব জন্যই যেন মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। অন্ধকার ধীরে ধীরে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

সন্ধ্যাসমাগমে অহর্ব্বল তটদেশে ইষ্টদেবতার উপাসনা করিবার জন্য উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি তন্ময়চিত্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলে—তাঁহার যেন মনে হইল যে দশভুজা দশহস্তে দশপ্রহরণ ধারণ করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতেছেন, "বৎস! অর্থেব জন্য অত উদ্বিগ্ন হইয়াছ কেন? কল্য অপরাহ্নকালে নবাবের সৈন্যগণ রাজস্ব লইয়া তোমার রাজ্যের নিকট দিয়া গমন করিবে। তুমি প্রহরীগণকে যুদ্ধে পবাস্ত করিয়া অর্থ গ্রহণ কর। তাহা হইলেই তোমার সমস্ত অভাব দূরীভূত হইবে। তুমি কিছুমাত্র ভীত হইও না! তোমার শক্তি যখন প্রবুদ্ধ, তখন সমরে তোমাকে নিরস্ত করে এমন সাধ্য কাহারও নাই। রণস্থলে একটী শ্বেত অশ্ব সর্ব্বদা তোমার পার্শ্বে পার্শ্বে রাখিবে, আমি অদৃশ্যভাবে সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া অরাতিনিধন করিব। তোমার শক্তিদর্শনে ভীত হইয়া নবাবই তোমার সহিত সখ্যতা স্থাপনে ইচ্ছুক হইবেন।

অনন্তর অহর্ব্বল 'জয় মা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। এই ভীষণ মনোমদ ধ্বনি নৈশগগনের স্তরে স্তরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অহর্ব্বল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কি যেন এক বৈদ্যুতিকশক্তি তাঁহার দেহমধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল,

তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ঝলসিতে লাগিল। মহাশক্তির আবেশে তাঁহার প্রাণে দুর্দ্দম্য তেজের আবির্ভাব হইল। আশায় তাঁহার বক্ষঃ স্ফীত হইয়া উঠিল। ধীরপদবিক্ষেপে তিনি প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

গৃহে উপস্থিত হইয়া অহর্ব্বল মণ্ডল ও প্রধান ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান করিয়া সন্ধ্যার সমস্ত ব্যাপার তাহাদিগকে যথাযথ বর্ণনা করিলেন। তাঁহারাও রাজার কথায় অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমস্ত আয়োজন করিতে প্রস্তুত হইল।



রণজয়।

প্রাতঃকাল হইতে রাজ্যের চতুর্দ্দিকে রণসজ্জার সাড়া পড়িয়া গেল। ভেরী, তুরী, দামামা ও ঢক্কার গুরুগম্ভীর নিনাদে বাড়া বাজ্য মুখরিত হইয়া উঠিল। সমর্থব্যক্তিগণ পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ স্ব স্ব অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিয়া মহোল্লাসে রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইল। তুরঙ্গের হ্রেষারবে ও মাতঙ্গের বৃংহিত ধ্বনিতে রাজপুরী পরিপূরিত হইয়া উঠিল। মল্লগণ তাম্রাচ্ছাদিত সপ্তহস্তপরিমিত, রায়বাঁশ লইয়া উপস্থিত হইল।

তৎকালে বঙ্গবীরগণ এই রায়বাঁশ এরূপ দক্ষতার সহিত ঘুরাইতে পারিত যে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিলে, এমন কি তীর ছুঁড়িলেও তাহা, ভীমবেগে ঘূর্ণিত, তাম্রপত্রাবৃত বংশদণ্ডে আহত হইয়া ভূপতিত হইত। মল্লগণ এই ভীষণ বংশদণ্ড প্রবলবেগে ঘুরাইতে ঘুরাইতে শত্রুব্যূহ ভেদ করিত। তরবারি, বর্শা, তীর, পরশু প্রভৃতি কোন প্রকার প্রহরণ দ্বারা 'রায়বাঁশ'ধারী যোদ্ধাকে নিরস্ত করা যাইত না।

যে কখনও বঙ্গীয় বীরগণের 'রায়বাঁশ' চালনা চক্ষে দেখিয়াছে, যে কখনও এই ভীষণ বংশদণ্ডের সাহায্যে তাহাদের লম্ফন ও উল্লম্ফন নয়নগোচর করিয়াছে, যে কখনও এই রায়বাঁশধারী বীর-গণের তাণ্ডব-সমর-নৃত্য ও রোমহর্ষণকারী বিভীষণ রণ-হুঙ্কার

শ্রবণ করিয়াছে, সেই বলিতে বাধ্য হইয়াছে যে ইহাদের এই সমস্ত বীরকার্য্য পৃথিবীতে অতুলনীয়। একজন বীর হুঙ্কার ছাড়িলে বোধ হইত যেন শত শত ভীমপরাক্রমশালী ব্যক্তি যুগপৎ এই ভয়ঙ্কর নিনাদ করিতেছে। সেই মহাত্রাসকারী নাদ শ্রবণ করিলে গর্ভিণীর গর্ভপাত হইত। অস্ত্র-শস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়া মহাবলশালী ব্যক্তিও প্রাণহীন পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল, নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, শিশুগণ প্রাণভয়ে মাতৃক্রোড়ে লুক্কায়িত হইত। এই হুঙ্কার-সাহায্যেই বঙ্গীয় দস্যুগণ গৃহস্থগণকে ত্রস্ত করিয়া অবলীলাক্রমে দস্যুবৃত্তি সাধিত করিত।

কিন্তু হায়! অধুনা ইহা উপকথায় পরিণত হইয়াছে।

কি ঐন্দ্রজালিক শক্তিবলে বঙ্গের এই অতুলকীর্ত্তি, এই অলৌকিক কার্য্যকুশলতা পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে! কি অভিশাপে সেই বীরবংশধরগণ কঙ্কালসার হইয়া প্রেতমূর্ত্তির ন্যায় এই বঙ্গশ্মশানে বিচরণ করিতেছে! কি পাপে আজ তাহাদের দেহে শক্তি নাই, মনে উৎসাহ নাই, হৃদয়ে তেজ নাই—কি কুকর্ম্মফলে এই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাহারা আজ ভিখারীর ভিখারী, একমুষ্টি অন্নের কাঙাল। যাহারা একদিন সমস্ত সভ্য-জগৎকে বিলাসীর বেশে সজ্জিত করিতে সমর্থ হইত, কি দুরদৃষ্টবশে আজ তাহারা লজ্জা-নিবারণের বস্ত্রের জন্য পরপদলেহী কুক্কুরাধম ভিক্ষুকের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী।

কে বঙ্গবাসীগণকে ভুল বুঝাইল যে তাহারা চির-ভীরু,

কাপুরুষ। কে তাহাদিগকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করিল যে তাহাদের আচার, ব্যবহার, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কে তাহাদিগকে শিখাইল যে এই কুসংস্কারবশতঃই তাহারা অল্পায়ু হইয়া জীর্ণ, শীর্ণদেহে দুর্ব্বহ জীবন-ভার বহন করিতেছে।

হে বঙ্গবাসীগণ! একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ—দেখিতে পাইবে, দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে তোমাদের সবই ছিল। তোমাদের বুদ্ধি ছিল, বিদ্যা ছিল, ধন ছিল, জন ছিল—তোমরা মহাবীর্য্যবান্ ও দীর্ঘায়ু ছিলে। যে মোহবশে জ্ঞানশূন্য হইয়া ধ্বংসের মুখে ধাবিত হইতেছ, সেই মোহাবরণ অপসারিত কর—দেখিবে তোমরা পৃথিবীর কোনও জাতি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহ, বরং অনেক বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

দেখ, বায়ড়াবাসীগণ আত্মোন্নতির জন্য কি অদম্য উৎসাহে আজ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। রাজা ও রাজ্যের জন্য তাহারা অকাতরে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের বংশধর তোমরা, কয়েক দিন পূর্ব্বে ভীষণ ইউরোপীয় সমরে রাজা ও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য জনকয়েক মুষ্টিমেয় যুবক ভিন্ন কয়জন নিজ প্রাণ বলি দিতে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলে!

দেখ, বায়ড়াবাসিনী রমণীগণ স্বীয় হস্তে স্বামী, পুত্র ও সহোদর-গণকে বীরবেশে সজ্জিত করিয়া তাহাদের হৃদয়ে অদম্য উৎসাহের বীজ বপন করিতেছে। আজ গৃহে গৃহে আনন্দ উৎসব হইতেছে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই প্রাণে মহাস্ফূর্ত্তি বিরাজ

করিতেছে। রাজধানী আজ আনন্দোৎসাহপূর্ণ জনসংঘ হৃদয়ে ধারণ করিয়া এক অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে।

আজ বৈশাখের শুক্লা অষ্টমী। বেলা দ্বিতীয় প্রহর। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ কিরণমালা বর্ষণ করিতেছে। দামোদরের সুবিস্তীর্ণ সৈকতভূমি ধূ ধূ করিতেছে। উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্য দিয়া ক্ষীণ জলস্রোত রজতদণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাপদগ্ধ জীবের জীবনরক্ষার জন্যই বিধাতা অমৃতধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 'তরমুজ' দামোদরের উর্ব্বরা তটভূমি সুশোভিত করিয়া পিপাসার্ত্ত পথিকের প্রাণে আনন্দ সঞ্চার করিতেছে। স্থানে স্থানে দুই একজন কৃষক ক্ষেত্রকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া নদীজলে অবগাহন করতঃ দেহ স্নিগ্ধ করিতেছে। ভীষণ রৌদ্রের উত্তাপে জনপ্রাণী গৃহমধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

কেবল শ্রীরামপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী নদীতটে প্রায় দুইশত দৃঢ়কায় বলবান্ ব্যক্তি এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে রন্ধন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে মুসলমানই অধিক; কয়েকজন মাত্র হিন্দুও আছে। তাঁহাদের আকার, ইঙ্গিত ও বেশ ভূষা দেখিলে তাহাদিগকে সৈনিকপুরুষ বলিয়াই অনুমান হয়। পঞ্চাশৎ পর্ব্বতপ্রমাণ হস্তী নদীজলে নামিয়া সুবলিত শুণ্ডসাহায্যে স্ব স্ব শরীরে বারি বর্ষণ করিতেছে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিদেশীয় বীরগণ ডাল রুটী প্রস্তুত করিয়া আহারে বসিল। ভোজনান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বীরসজ্জায় সজ্জিত হইল। হস্তিগণকে নদীজল হইতে তুলিয়া

আনিয়া তাহাদের পৃষ্ঠে 'হাওদা' বাঁধিয়া দিল। তৎপরে প্রতি কুঞ্জরে চারিজন পুরুষ আরোহণ করিয়া নদীকূল ধরিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

হঠাৎ শতাধিক হস্তী সম্মুখে আসিয়া ইহাদের গতিরোধ করিল, এবং সর্ব্বাগ্রগামী মাতঙ্গের পৃষ্ঠদেশ হইতে এক বর্ম্মাবৃতদেহ বীর উচ্চ চীৎকার করিয়া বলিল, "বায়ড়ার রাজা মহাবীর অহর্ব্বলের আদেশক্রমে আমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তোমাদেব সম্মুখীন হইয়াছি। যদি জীবনের আশা থাকে, পদমাত্রও অগ্রসর হইও না এবং তোমাদের নিকট যাহা কিছু অর্থ আছে তৎসমুদায় বিনা বাক্যবয়ে রাজা অহর্ব্বলকে অর্পণ কর। এই রাজাজ্ঞার অন্যথাচরণ করিলে, এখনই সকলকে শমনসদনে গমন করিতে হইবে।" এই গর্ব্বোক্তি শ্রবণ করিয়া দীর্ঘায়তবপু উষ্ণীষধারী প্রতিপক্ষীয় এক বীর কটিবদ্ধ কোষ হইতে অসি সবলে বহিষ্কৃত করিল। তাঁহার সুদৃঢ় হস্তে উলঙ্গ কৃপাণ সূর্য্যকরে ঝলসিতে লাগিল।

বীরপুঙ্গব ক্রোধারুণলোচনে ভৎর্সনাস্বরে বলিতে লাগিলেন, "বঙ্গদেশে এমন বীর কোথায় আছে যে গৌড়েশ্বর মহাবীব হোসেনসার শত্রুতাচরণ করিতে সাহসী হয়। সে কি জানে না, গৌড়েশ্বরের সামান্য ইঙ্গিতমাত্রে কত শত রাজার উত্থান পতন প্রতিনিয়ত সংসাধিত হইতেছে। কে সে অহর্ব্বল যে গৌড়াধিপের রাজস্ববাহী করীযুথের গতিরোধ করিতে সাহসী হয়? সে কি বুঝে না যে সাক্ষাৎ শমনের সহিত শত্রুতা করিতে

প্রয়াসী হইয়াছে! তীব্রবিষধর ফণীর মুখগহ্বরে হস্তক্ষেপ করিলে বরং জীবনের আশা থাকিতে পারে কিন্তু মহাশক্তিধর হোসেন-সার কোপবহ্নিতে পড়িলে একেবারেই যে ভস্মীভূত হইতে হইবে, এ কথা কি অর্ব্বাচীন একবারও ভাবিয়া দেখে নাই। যাহা হউক বঙ্গেশ্বর হোসেনসার মহাগৌরবান্বিত নাম গ্রহণ করিয়া আজ্ঞা করিতেছি, "তিলেক বিলম্ব না করিয়া আমাদের সম্মুখ হইতে অপসারিত হও, নচেৎ এই মুহূর্ত্তেই দুইশত সুশিক্ষিত বীরের অস্ত্রমুখে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে।"

এই কথা শুনিবামাত্র অহর্ব্বলের পক্ষাবলম্বীগণ অরাতিশরীরে তীর ও বর্যা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। ঘোরতর সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। নবাবের সুশিক্ষিত সৈন্যগণ ভীমপরাক্রমে রাজার সৈন্যদল আক্রমণ করিল। এই ভীষণআক্রমণবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক বীর ধরাশায়ী হইল। বহু কুঞ্জর ছিন্নশুণ্ড ও ভিন্নদেহ হইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল। নবাবসৈন্যগণ জয়োল্লাসে ঘন ঘন হুঙ্কার করিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ প্রায় একশত অশ্বারোহী বীর হোসেনসার বিজয়িনী সেনার পশ্চাদ্দেশ আক্রমণ করিল। বীরবর অহর্ব্বল অতি ক্ষিপ্রগামী এক শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া একহস্তে ভীষণ শূল ও অন্যহস্তে আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। তাঁহারই পার্শ্বে পার্শ্বে আরোহীবিহীন আর একটী সুসজ্জিত শ্বেতঅশ্ব গমন করিতে লাগিল। বীরবর অহর্ব্বল ও তাঁহার অনুচরগণ এরূপ বীরত্বের সহিত সুকৌশলে

যুদ্ধ করিতে লাগিল যে সুদক্ষ মুসলমান সৈন্যগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। বহু মুসলমান যোদ্ধা প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল। অনন্তর বীরকুলকেশরী অহর্ব্বলেব বীর্য্যবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া নবাবের সৈন্যগণ বশ্যতাব নিদর্শন স্বরূপ অস্ত্রত্যাগ করিল। তখন রাজা অহর্ব্বল বিপক্ষ-হস্তিপৃষ্ঠ হইতে সমস্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া হিন্দু-বীরগণের পৃষ্ঠে স্থাপন করতঃ স্বীয় রাজধানী অভিমুখে সদলবলে প্রস্থান করিল। নবাবেব হতাবশিষ্ট সৈন্যগণও গৌড় অভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

কথিত আছে, অহর্ব্বল এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নবলক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হন। এই যুদ্ধের পর হইতেই তিনি 'রণজিৎ' নাম ধারণ করেন এবং স্বীয় রাজ্য যথাসাধ্য সুদৃঢ় করিতে যত্নবান্ হন। রাজা রণজিৎ স্বীয় পুরীর চতুর্দ্দিকে সুগভীর পরিখা খনন করাইয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে যে সুবিস্তৃত পাহাড়সদৃশ মৃন্ময় প্রাচীর নির্ম্মাণ করান, তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও মৃত্তিকাপ্রোথিত প্রাচীন ইষ্টকরাশি দর্শন করিলে বঙ্গীয় বীর 'রণজিতের' অসামান্য বীরত্ব-কাহিনী মনোমধ্যে উদিত হইয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে প্রাণকে উৎফুল্ল ও অবসন্ন করে।

রণজিৎকে দমন করিবার জন্য হোসেন-সার সৈন্য প্রেরণ, পরাজয় ও সন্ধিস্থাপন।

রাজস্বলুণ্ঠনের ব্যাপার অবগত হইয়া হোসেনসা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন। যদিও তিনি শান্তিপ্রিয় ছিলেন বটে তথাপি রণজিতের এই দুর্বিনীত ব্যবহার অগ্রাহ্য করা রাজধর্ম্মবিগর্হিত বিবেচনা করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্যসজ্জা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সহস্র সহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইয়া 'বায়ড়া' রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আষাঢ়ের প্রথমে নবাবের সৈন্যগণ মহাগর্ব্বভরে দামোদর-তটে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল। সৈন্যগণ দেশমধ্যে অত্যাচার, উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। গৃহস্থগণের ধন, ধান্য ও গো, ছাগাদি পশু বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিতে লাগিল। রমণীগণ সতীত্ব রক্ষার জন্য ত্রস্ত হইয়া উঠিল। দেশ বিভীষিকাপূর্ণ হইয়া পড়িল।

মহাবীর রণজিৎ বিপুল নবাববাহিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য প্রাণপণে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তিনি বিধর্ম্মী, মহা অত্যাচারী মুসলমানগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য প্রজাগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ

অনেকেই দুর্দ্ধর্ষ ও সুশিক্ষিত অগণিত নবাবী-সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু অহঙ্কারবিমূঢ়বুদ্ধি, বিচ্ছৃঙ্খল মহম্মদীয় সৈন্যগণের অত্যাচার যখন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, যখন গৃহস্থগণের ধনরত্ন লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, যখন রমণীগণের সতীত্ব রক্ষা করা ভার হইয়া উঠিল, তখন আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মুসলমান সৈন্যগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। সমস্ত সমর্থ ব্যক্তি রাজা রণজিতের সাহায্যার্থ তাঁহার কেতনতলে সমবেত হইতে লাগিল। সুপ্তদেশ যেন জাগিয়া উঠিল—মহা উত্তেজনায় সমস্ত দেশ পরিপূর্ণ হইল। সকলেই স্ব স্ব স্ত্রী, ভগ্নী ও কন্যার সম্মান রক্ষার জন্য নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিল। সকলেরই অন্তর্নিহিত শক্তি যুগপৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমস্ত দেশকে মহাশক্তির এক অপূর্ব্ব ভয়ঙ্করী জ্বালাময়ী দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করিল।

দামোদরতীরবর্ত্তী শ্রীরামপুর নামক গ্রামে কতকগুলি ধনশালী সুবর্ণবণিক বাস করিত। তাহারা এপর্য্যন্ত, নিরপেক্ষ ভাবে অবস্থান করিতেছিল। এক দিন ইয়াকুব খাঁ নামক এক মুসলমান সেনানায়ক, অশ্বপৃষ্ঠে গ্রামমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, নিকটবর্ত্তী এক অট্টালিকার ছাদে নবযৌবনসম্পন্না এক সুন্দরী ললনা আলিসার উপর দেহভার রক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। সুন্দরীর আলুলায়িত ভ্রমরকৃষ্ণকুঞ্চিতকেশপাশ আলিসা পার হইয়া মৃদুপবনহিল্লোলে ঈষৎ সঞ্চালিত

হইতেছে। সুবর্ণালঙ্কারভূষিত, নবনীতকোমল, মৃণালগঞ্জিত, কষিতকাঞ্চনকান্তি বামবাহু যুবতীর বামগণ্ডে বিন্যস্ত রহিয়াছে। কমনীয়প্রফুল্লবদনমণ্ডলে চঞ্চলখঞ্জনগঞ্জন নয়নযুগল মহানন্দভরে ইতস্ততঃ নৃত্য করিতেছে।

যুবতীর মুনিমনোমোহন নয়নদ্বয় সেনাপতির সতৃষ্ণলোচনে হঠাৎ সংলগ্ন হইবামাত্র দামিনীরূপিণী কামিনী নীলবস্ত্রাঞ্চলে সুবিমল চন্দ্রানন আবৃত করিয়া চঞ্চলা চপলাবেগে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিল।

সেনাপতি অচল, অটল। তাঁহার পলকহীন দৃষ্টি ছাদের দিকে আবদ্ধ। কিছুক্ষণ এইরূপ তন্ময়ভাবে অবস্থান করিয়া মুসলমান-যুবক চিন্তাভারাক্রান্তহৃদয়ে শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সেনাপতি রমণীরত্নলাভেচ্ছায় তাহার পিতা শোভাচাঁদ সেনের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূত শোভাচাঁদের নিকট এই ঘৃণিত প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তিনি তাঁহাকে তীব্র তিরস্কার করিয়া স্বীয় ভবন হইতে দূর করিয়া দিলেন।

শোভাচাঁদের এইরূপ ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া ঈয়াকুব তাঁহার মনোমুগ্ধকারিণী সুন্দরী রমণীকে বলপূর্ব্বক হস্তগত করিবার আশায় পরদিন মধ্যাহ্ন-কালে শোভাচাঁদের প্রাসাদতুল্য সুবৃহৎ গৃহ সদলবলে আক্রমণ করিলেন।

দূতকে দূরীভূত করিয়াই শোভাচাঁদ প্রাণভয়ে এবং অন্তঃপুর-বাসিনী কামিনীগণের সতীত্ব রক্ষার জন্য বায়ড়ার রাজা রণজিতের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। রণজিৎও মুসলমানের অত্যাচার হইতে

শোভাচাঁদকে রক্ষা করিবার জন্য শতাধিক রণকুশল, সাহসী যোদ্ধা রজনীযোগে তাঁহার ভবনে প্রেরণ করেন। হিন্দুসৈন্যগণ এতাবৎকাল শোভাচাঁদের গৃহমধ্যে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু যখন ঈয়াকুবপ্রমুখ মুসলমানযোদ্ধাগণ শোভাচাঁদের বাটীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ফেলিল, তখন তাহারা সিংহবিক্রমে শত্রুগণের উপর নিপতিত হইল। উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহু হিন্দুবীর অদ্ভুত বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া অরাতিনিপাত করিতে করিতে সমরাঙ্গনে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল। অসংখ্য মুসলমানসৈন্য মুষ্টিমেয় হিন্দুবীরগণকে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। প্রায় সমস্ত হিন্দু-যোদ্ধা নিহত হইল। মুসলমানসেনা বিজয়োল্লাসে ভৈরব গর্জ্জন করিয়া দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিল। এইবার বুঝি শোভাচাঁদের ধন, প্রাণ, জাতি, কুল, মান সব যায়। শোভাচাঁদ সপরিবারে এক প্রাণে এক মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন।

হঠাৎ অনতিদূরে বহুসহস্রবীরের রণহুঙ্কার শ্রুতিগোচর হইল। মুসলমান সৈন্যগণ শোভাচাঁদের গৃহপ্রবেশ হইতে নিবৃত্ত হইয়া শত্রুগণের দিকে ধাবিত হইল। এবার ভীষণ সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। রাজা রণজিতের সৈন্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে মুসলমানসেনা আক্রমণ করিল। এই মহারণে উভয় পক্ষেই বহু যোদ্ধা হতাহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পূর্ণ করিল। বিজয়লক্ষ্মী কখনও মুসলমানগণের প্রতি কখনও বা হিন্দুগণের উপর কৃপাকটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইল, তখনও যুদ্ধের বিরাম নাই। রজনীর অন্ধকারে দেশীয় হিন্দুসৈন্যগণ, মহোৎসাহে ও ভীমবিক্রমে নবাবের সৈন্যগণকে নিহত করিতে লাগিল। মুসলমান বীরগণ মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা যুদ্ধবিরামের জন্য বারম্বার প্রার্থনা করিলেও রাজা রণজিৎ তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন।

মুসলমানগণের বিপদের উপর আবার এক মহা বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ভীম প্রভঞ্জন প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুসলধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। রণজিতের রণহস্তিগণ এই সময়ে ছত্রভঙ্গশত্রুসৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল।

আবার কি সর্ব্বনাশ! দামোদর কি রমণীর অবমাননাকারীগণকে সমুচিত দণ্ড দিবার জন্যই উত্তালতরঙ্গবাহু বিস্তার করিয়া করাল গর্জ্জন করিতে করিতে তটদেশ প্লাবিত করিয়া মহাবেগে ছুটিল? হায়! হায়! নিমেষমধ্যে দামোদরের জলরাশি সমস্ত দেশ ডুবাইয়া দিল! বহু মুসলমান-সৈন্য ও অশ্ব বন্যার বেগে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। খাদ্যাদি ও সমস্ত যুদ্ধোপকরণ কোথায় যে ভাসিয়া গেল তাহার কিছুই স্থিরতা রহিল না। এই দৈবদুর্ব্বিপাকে অধিকাংশ মুসলমান্-সৈন্য নিহত হইল এবং অবশিষ্ট অতি কষ্টে পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইল। এই যুদ্ধে রণজিৎ সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়া বঙ্গদেশে একজন বিখ্যাতবীর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।

ধীরমতি নবাব হোসেন খাঁ এই পরাজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিচলিত হইলেন না। তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন রণজিৎ মহাসাহসী ও বীরপুরুষ এবং তাঁহার রাজ্যের সমস্ত সমর্থব্যক্তিই রণকুশল এবং দেশরক্ষার্থ অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত। এরূপ অবস্থায় যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করা নির্ব্বোধের কার্য্য। কারণ আমার বিপুলবাহিনীর সহিত যুদ্ধে যদিই রণজিৎ কখনও কোন প্রকারে পরাস্ত হয়, সমরাবসানে সে আবার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং এই বায়ড়া-রাজ্য করায়ত্ত করিতে আমাকে দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিতে হইবে—একটীমাত্রও অস্ত্রধারণ-ক্ষম ব্যক্তি জীবিত থাকিতে এই রাজ্য কখনও বশীভূত হইবে না। আর রণজিৎ যদি আমার সৈন্যগণকে পুনরায় পরাজিত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার উৎসাহ ও বিক্রম শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে—সে বিক্রমবহ্নিমুখে আমার বঙ্গরাজ্যও পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতে পারে। অতএব তাহাকে যুদ্ধ দ্বারা বশীভূত করিতে চেষ্টা করা অপেক্ষা কৌশলে আয়ত্তাধীন করা সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর।

এইরূপ স্থির করিয়া বহুদর্শী, বিচক্ষণ নবাব হোসেনসাহ বায়ড়ার রাজা রণজিতের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন এবং তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। রণজিৎও সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া বার্ষিক নামমাত্র কর দিতে অঙ্গীকার করিলেন। রাজা রণজিৎ হোসেন খাঁর দরবারে অতি উচ্চপদ ও সম্মান লাভ করিয়া নিরুদ্বেগে রাজ্যের উন্নতিবিধানে যত্নবান্ হইলেন।

বিক্রমপুরে বিশালাক্ষ্মী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা।

শক্তিসাধক মহাভক্ত রণজিৎ যেস্থানে শবসাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন সেই স্থানে এক সুন্দর দেউল নির্ম্মাণ করিয়া দেবী-মূর্ত্তি স্থাপন করিতে তাঁহার প্রাণে একান্ত বাসনা ছিল। এত-দিন রাজ্যস্থাপন ও রাজ্যের সুশৃঙ্খলা বিধান করিতে ব্যতিব্যস্ত থাকায়, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া উপযুক্ত শিল্পীর সাহায্যে দেউল নির্ম্মাণ করাইলেন। এই মন্দিরমধ্যে ধাতুময়ী. মৃণ্ময়ী কিম্বা দারুময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত করিবেন এই চিন্তা তাঁহাব মনোমধ্যে উদিত হইল। বহু চিন্তা করিয়াও কি পদার্থে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবেন. কিছুই স্থিব করিতে পারিলেন না। অনন্তর একদিন নিশাকালে শয্যায় শায়িত হইয়া এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাবিষ্ট হইলেন।

স্বপ্নযোগে তিনি যেন দেখিতে পাইলেন "শিবমনোমোহিনী, কৈলাসবাসিনী উমা মহিষাসুরনাশিনী দশভূজা মূর্ত্তি ধারণ কবিয়া তাঁহার সম্মুখে বিরাজিতা। দেবী বরাভয়-করাম্বুজ রাজার সম্মুখে উত্তোলন করিয়া সহাস্যবদনে মৃদু-মধুর-স্নেহপূর্ণ-বচনে যেন বলিতেছেন,—বৎস! আমার মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য তোম র বিশেষ চিন্তিত হইবার আবশ্যকতা নাই। বায়ড়ায় প্রথম আসিয়া তুমি

যে পুষ্করিণীতীরে বিশ্রাম করিয়াছিলে, সেই পুষ্করিণীর জলমধ্যে একটী অতি প্রাচীন প্রস্তরখণ্ড নিমজ্জিত আছে। সেই প্রস্তরখণ্ড পুষ্করিণীজল হইতে উদ্ধার করিয়া মন্দিরমধ্যে স্থাপন কর। আমি ঐ প্রস্তরখণ্ডেই আবির্ভূত হইব।"

এই কথা বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন এবং সানন্দমনে স্বপ্নের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রজনীর অবশিষ্টাংশ যাপন করিলেন। অনন্তর প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক মন্ত্রণাভবনে উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রীগণ ও রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-বর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া সুদক্ষ ধীবরগণকে আহ্বান করিলেন। রাজাজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র বহুসংখ্যক ধীবর আসিয়া নৃপতিচরণে প্রণত হইল এবং সোৎসাহে পুষ্করিণীমধ্যে অবতরণ করিয়া প্রস্তর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। বহুক্ষণ অন্বেষণের পর একজন ধীবর গভীর জল হইতে প্রস্তরখানি উদ্ধার করিয়া তীরদেশে উপস্থিত হইল।

দেবীকথিত প্রস্তরখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া রাজা রণজিৎ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং ইহা শাস্ত্রানুযায়ী প্রতিষ্ঠা করিবার মানসে বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণকে সাদরে ও সসম্মানে নিমন্ত্রণ করিলেন। নানা দিগ্দেশ হইতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বায়ড়া-রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলেন।

রাজা ব্রাহ্মণগণকে সসম্ভ্রমে সম্বর্দ্ধনা করিয়া পাদ্যার্ঘ দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন এবং তাঁহাদের নিকট স্বপ্নবিবরণ নিবেদন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া

পরম ধার্ম্মিক, দেবীর প্রিয়পাত্র রাজা রণজিতের উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তাঁহার রাজ্যে সানন্দে কয়েক দিবস বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক শুভদিনে রাজা উপযুক্ত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা দেবী-কথিত প্রস্তরখণ্ড মন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করাইলেন।

রাজ্যমধ্যে মহা মহোৎসব হইতে লাগিল। তিন দিন ধরিয়া ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কাঙ্গালী-ভোজন চলিতে লাগিল। রাজা অকাতরে প্রার্থীগণকে অন্ন, বস্ত্র ও অর্থদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। দেবী বিশালাক্ষী নামে অভিহিতা হইলেন। এখনও বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির প্রাচীন স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

———

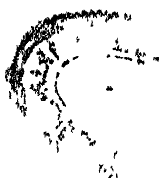
দক্ষিণ ও পশ্চিম-বঙ্গের নরপতিগণের 'বায়ড়া' গমন।

এই মহোৎসব সময়ে বায়ড়াধিপ রণজিৎ চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী হিন্দু-ভূপালগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া একতাসূত্রে আবদ্ধ হইবার আশায় অতি বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রিত রাজগণও যবনগর্ব্বখর্ব্বকারী, মহাপরাক্রমশালী রণজিতের সহিত সখ্যতাস্থাপনে আগ্রহান্বিত হইয়া নবপ্রতিষ্ঠিত 'বায়ড়া'-রাজ্যে আগমন করিতে লাগিলেন।

কর্ণগড়ের রাজা স্বরূপচন্দ্র, ঢেকুরের রাজা ইছাই ঘোষ, নারায়ণগডাধিপতি নীলাম্বর, মঙ্গলকোটের রাজা গজপতি, গড়-ভবানীপুরের রাজা সত্যনারায়ণ সদলবলে বায়ড়ারাজ্যে আসিযা উপস্থিত হইলেন। রাজা রণজিৎ সমাগত নরপতিগণের যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহাদের বাসের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে ভালুকীর রাজা মহেন্দ্রলাল, তমলুকাধিপতি নিত্যানন্দ ও সিউরের রাজা যশোবন্ত বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে মহাবীর রণজিতের রাজ্যে আগমন করিলেন। রাজগণের আগমনে বায়ড়ারাজ্য এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। অশ্বের হ্রেষারবে, মাতঙ্গের বৃংহিত ধ্বনিতে, ভেরী, তুরি, দামামা ও ঢক্কার তুমুল শব্দে এবং লোকজনের কল কল্প রবে নগরী মহা কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। শান্তিরক্ষাকারী রাজপুরুষগণ

সুসজ্জিত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া রাজপথে বিচরণ করিতে লাগিল। সমস্ত নগরী মহানন্দে পরিপূর্ণ হইল। দুঃখ, কষ্ট ও নিরানন্দ সভয়ে রাজপুরীর সীমা অতিক্রম করিয়া দূরে পলায়ন করিল।

সমাগত নৃপতিগণ রাজা রণজিতের ভক্তিনম্র আচরণে অত্যন্ত প্রীত হইয়া, তাঁহার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং বায়ড়ারাজ্যে কয়েক দিবস মহানন্দে যাপন করিয়া স্ব স্ব রাজ্যাভি-মুখে প্রস্থান করিলেন।





রণজিৎ ভাল্কীর রাজা মহেন্দ্রলালের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তদীয় রাজ্যে গমন করিলেন।

ভালুকীগড়ের রাজা মহেন্দ্রলাল রায় বায়ড়া হইতে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি রণজিতের সৌজন্যে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে ভালুকীতে ফিরিয়া আসিয়াই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। রণজিৎও দুই চারিজন মাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া মহেন্দ্রলালের রাজ্যে গমন করিলেন। মহেন্দ্রলাল বায়ড়ার রাজা রণজিতের যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া গেলেন। ভালুকীগড়ে মহামহোৎসব হইতে লাগিল। রণজিতের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য প্রতিদিন নৃত্যগীত হইতে লাগিল। রণজিৎ মহানন্দে ভালুকীর গড়ে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন মধ্যাহ্নকালে রাজা মহেন্দ্রলাল রণজিতের সহিত অন্তঃপুরস্থ ভোজনাগারে আহার করিতে বসিয়াছেন। এমন সময়ে এক পরিচারিকা "রাজকন্যা খিড়কীর পুকুরে স্নান করিতে গিয়া ডুবিয়া গিয়াছে" বলিয়া বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। রাজপরিবারস্থ মহিলাবৃন্দ ও দাসীগণ সকলেই মহা ব্যস্ততার সহিত অন্তঃপুরস্থ সরোবরের দিকে ছুটিল। রাজপরিবারে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

রাজা মহেন্দ্রলাল ও রণজিৎ উভয়েই অতি ব্যস্ত ও ত্রস্তভাবে আহারত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং দ্রুতগতিতে সরোবর-তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজপরিবারভুক্ত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তীরদেশে দণ্ডায়মান হইয়া চীৎকার করিতেছে; কেহই জলমগ্না কন্যাকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রকৃত চেষ্টা করিতেছে না। ইহা দেখিয়া মহাসাহসী রণজিৎ অতি ক্ষিপ্রতার সহিত এক লম্ফে সরোবরজলে পতিত হইলেন এবং বারিমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া ক্ষণপরেই রাজকন্যার হস্তধারণ করিয়া তীরে উপস্থিত হইলেন।

তৎপরে পরিচারিকাগণ অচৈতন্যা রাজকন্যাকে ধরাধরি করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেল এবং সিক্তবস্ত্র ত্যাগ করাইয়া শুষ্কবসন পরিধান করাইল। রাজকন্যা শয্যার উপর শায়িত হইলে রাজা মহেন্দ্রলাল, রণজিৎকে সঙ্গে করিয়া কন্যাকে দেখিতে গেলেন। তৎক্ষণাৎ রাজবৈদ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। বৈদ্যবর উপযুক্ত চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরেই রাজকন্যার চৈতন্য হইল। তখন সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইয়া রণজিৎকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। রাজা মহেন্দ্রলাল কৃতজ্ঞতাপ্রকাশচ্ছলে দুই হস্তে রণজিতের হস্ত ধারণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রাণ ভাবোচ্ছ্বাসে এতই পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে তাঁহার মুখ হইতে একটী বাক্যও নিঃসৃত হইল না, কেবল নয়নদ্বয় হইতে দরবিগলিতধারে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। রণজিৎ যতই তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, ততই চক্ষের জল

প্রবলবেগে বহির্গত হইতে লাগিল, অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন।

রণজিৎ ভালুকীরাজের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রাজন্! আমি কর্ত্তব্যকর্ম্ম মাত্র করিয়াছি, তজ্জন্য আপনি এতদূর কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকাশ করিতেছেন কেন? সাধ্যসত্ত্বে যে ব্যক্তি আর্ত্তের আর্ত্তিনাশ করিতে, দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে, অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন করিতে চেষ্টা না করে সে কখনও মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে না। আর সামান্য চেষ্টা দ্বারা যদি কাহারও জীবনরক্ষা করিতে পারা যায়—এরূপ চেষ্টা যে ব্যক্তি যথাসাধ্য না করে সে কি নরসমাজের কলঙ্ক নহে? অতএব আপনার কন্যাকে জল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া আমি যে কার্য্যটুকু করিয়াছি তাহা না করিলে আমি ত মনুষ্যমধ্যে গণ্যই হইতাম না, পরন্তু পশুরও অধম বলিয়া বিবেচিত হইতাম। সুতরাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আপনার এতাদৃশ কাতরতা দেখাইবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই।

রণজিতের বাক্য শেষ হইলে রাজা মহেন্দ্রলাল মনের আবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "বীরবর! আপনার গুণের সীমা নাই। আপনি নিজভুজবলে সুবিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর, আপনার বীরত্বে পাঠানরাজ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত। আপনি বঙ্গের বীরকুলচূড়ামণি। আপনি বীরত্বে যেরূপ শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন, দয়া, ধর্ম্ম, বিনয়, পরোপ-

কার, নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াও তদ্রূপ মানবসমাজের আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন। আপনার মহত্ত্বের তুলনা নাই।

রাজা মহেন্দ্র এই কথা বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, রাজকন্যা বুঝিতে পারিলেন যে এই উন্নতবপুঃ, বিশালবক্ষ, আজানুলম্বিতবাহু, সুন্দর যুবকই তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা। প্রাণত্রাণ-কারী যুবকের অপরূপ রূপমাধুরী নয়নগোচর করিয়া এবং পিতার মুখে তাঁহার অলৌকিক গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া যুবতী স্বীয় প্রাণ, রক্ষাকর্ত্তার চরণতলে উৎসর্গ করিলেন।

মহাবীর রণজিৎও পরমরূপলাবণ্যবতী রাজকন্যার অলোক-সামান্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া একেবারেই তদ্গতচিত্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যদি রাজা মহেন্দ্রলাল তাঁহার উপকারের প্রত্যুপকার করিবার আশা করেন তাহা হইলে এই রমণীরত্ন দান করিলেই যথেষ্ট হইবে। রণজিৎ স্বীয় মনোভাব রাজা মহেন্দ্রলালকে বলিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু দুরন্ত অভিমান আসিয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিল। তিনি মনে করিলেন যে কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করা অপেক্ষা ঘৃণাজনক হেয় কার্য্য আর নাই। আর প্রার্থনা সত্ত্বেও যদি রাজা তাঁহার কন্যা সমর্পণ করিতে অনভিমত প্রকাশ করেন তাহা হইলে তদপেক্ষা অপমান ও লজ্জাজনক ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না।

এইরূপ নানা চিন্তায় রণজিৎ অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু শীঘ্রই মনের দুর্ব্বলতায় অতিশয় লজ্জিত হইয়া দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেন এবং বহির্ব্বাটীতে আসিবার জন্য উদ্যত হইলেন।

রণজিৎ অর্দ্ধাশন করিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিলেন, সেইজন্য রাণী স্বয়ং তাঁহার আহারের আয়োজন করিয়া পরিচারিকা দ্বারা রাজাকে সংবাদ দিলেন। রাজা মহেন্দ্র রণজিতের নিকট রাণীর অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া, নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলে, রণজিৎ পুনরায় ভোজনে ইচ্ছুক না হইলেও তাঁহাদের সম্মান-রক্ষার জন্য আহারগ্রহণে সম্মত হইলেন।

রণজিৎ আহারান্তে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। তাঁহার মানসপটে রাজকন্যার মোহিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। তিনি তন্ময়চিত্তে হরিণনয়না, কৃশোদরী সুন্দরীর কথা ভাবিতে লাগিলেন। কি উপায়ে তিনি এই রমণীরত্ন লাভ করিতে পারিবেন—এই চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে প্রতিনিয়ত সমুদিত হইতে লাগিল। রণজিৎ একবার মনে করিলেন রাজা মহেন্দ্রকে এই সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলেন, আবার ভাবিলেন—"না, নিজের মুখে একথা বলা বড় লজ্জার বিষয়। রাজা যদি এই প্রস্তাবে অসম্মত হন তাহা হইলে আর অপমানের সীমা থাকিবে না। গৃহে গমন করিয়া কোন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা রাজা মহেন্দ্রলালের নিকট এই প্রস্তাব করিয়া পাঠানই যুক্তিসিদ্ধ

রণজিতের 'বায়ড়ায়' প্রত্যাগমন ও বিবাহপ্রস্তাব করিবার জন্য ভাল্‌কী-গড়ে দূতপ্রেরণ।

এইরূপ স্থির করিয়া রণজিৎ রাজা মহেন্দ্রলালের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বীয়রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাব আগমনে প্রজাগণ অত্যন্ত প্রীত হইয়া আনন্দোৎসব করিতে লাগিল। সম্ভ্রান্তব্যক্তিবর্গ রাজসন্দর্শনের জন্য রাজবাটীতে আগমন করিলেন। রাজা রণজিৎ তাঁহাদিগকে পরম সমাদবে আপ্যায়িত করিলেন। অনন্তর রাজা রণজিৎ অমাত্যগণপরি-বেষ্টিত হইয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে রাজসভায় আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সভায় সমাগত হইলে রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন, "হে মহানুভবগণ, আপনারা সকলেই জানেন আমি রাজা মহেন্দ্রলালেব দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া ভালুকীর গড়ে গমন করিয়াছিলাম। সম্প্রতি সে স্থান হইতে বায়ড়ায় প্রত্যাগত হইয়াছি। রাজা মহেন্দ্রলালের একটী সুন্দরী কন্যা আছে। আমি সেই কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কবি। এই বিষয়ে আমি আপনাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করি।"

রাজা রণজিতের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই [illegible]বাক্যে বলিলেন, "রাজন্! ভালুকীগড়াধিপতি রাজা মহেন্দ্রলাল

সদ্গোপবংশীয়। এই বিখ্যাত বংশসম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য প্রবাদ প্রচলিত আছে। তজ্জন্য এই বংশীয় নরপতিগণ সদ্গোপ হইলেও আচণ্ডালব্রাহ্মণ সকলেই ইহাঁদের যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে। সংক্ষেপে ইহাদের বংশপরিচয় বলিতেছি শ্রবণ করুন।”

“একদা ভালুকীরাজ্যে একটী মনোহর পুষ্পোদ্যান ছিল। ঐ উদ্যানে পুষ্পচয়নার্থ বিদ্যাধরীগণ রজনীশেষে বিমান-পথে আগমন করিত এবং প্রাতঃকাল হইবার পূর্ব্বেই কুসুম আহরণ করিয়া প্রস্থান করিত। উদ্যানস্বামীর যুবকপুত্র প্রাতঃকালে আসিয়া উদ্যানমধ্যে একটী পুষ্পও দেখিতে পাইত না।

কয়েকদিন উপর্য্যুপরি এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইলে পর, যুবক একদিন সমস্ত রজনী জাগরিত থাকিয়া উদ্যানের এক নিভৃত অংশে লুক্কায়িত রহিল। যামিনীর শেষ যামে বিদ্যাধরীগণ কুসুমচয়নের জন্য উদ্যানমধ্যে অবতীর্ণ হইল। তাহাদের রূপে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইল। যুবক এই দিব্যাঙ্গনাগণের অলৌকিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত হইল। বিদ্যাধরীগণ উদ্যানের সমস্ত পুষ্প সংগ্রহ করিয়া আকাশপথে উড্ডীয়মান হইলে, যুবক দ্রুতপদে গোপনীয় স্থান হইতে বহির্গত হইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তিনী বিদ্যাধরীকে ধরিয়া ফেলিল। বিদ্যাধরী যুবকের আলিঙ্গন পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হইতে পারিল না। যুবক তাহাকে ভুজপাশে আবদ্ধ করিয়া উদ্যানস্থ কুটীরমধ্যে আনয়ন করিল। বিদ্যাধরী যুবকের পদ-প্রান্তে পতিত হইয়া অনেক অনুনয়-বিনয়

করিতে লাগিল, কিন্তু যুবক তাহাকে ছাড়িয়া দিতে কিছুতেই স্বীকার করিল না। কাযে কাযেই বিদ্যাধরী উদ্যানে বাস করিতে বাধ্য হইল।

যুবক প্রতিদিন রজনীযোগে উদ্যানে আসিয়া বিদ্যাধরীর সহবাসে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, বিদ্যাধরী অন্তঃস্বত্বা হইল এবং দশম মাসে এক পরমরমণীয় সুকুমার পুত্র-প্রসব করিয়া তাহাকে লালন-পালন করিতে লাগিল। পুত্র জন্মাইবার একমাস পরে যুবক এক রজনীতে সর্পাঘাতে ইহলীলা সম্বরণ করিল। অনন্তর বিদ্যাধরী শোকসন্তপ্তা হইয়া আর পৃথিবীতে একাকিনী অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিল না। কিন্তু মনুষ্যের ঔরসজাত পুত্রকে লইয়া স্বগণের সহিত মিলিত হইতে অত্যন্ত লজ্জাবোধ হওয়ায়, শিশুপুত্রকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করতঃ বিদ্যাধরী স্বস্থানে প্রস্থান করিল। এক ভল্লুকী এই নিরাশ্রয় শিশুকে স্বীয় গুহায় লইয়া গিয়া স্তন্যদানে পালন করিতে লাগিল।

একদিন ভল্লুকী শিশুকে গুহায় রাখিয়া আহারান্বেষণে গমন করিয়াছে। শিশু ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া চীৎকার করিতেছে। এমন সময়ে এক দরিদ্রা সদেগাপকন্যা কাষ্ঠাহরণের জন্য ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে বনমধ্যে মনুষ্যশিশুর রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল এবং ঐ ক্রন্দনশব্দ লক্ষ্য করিয়া ভল্লুকীর গুহার নিকট উপস্থিত হইলে, দেখিতে পাইল—এক পূর্ণচন্দ্রসম শোভাস্পদ সুকুমার শিশু মৃত্তিকার উপর পড়িয়া

চীৎকার করিতেছে। রমণী শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে অগ্রসর হইল, আবার কি জানি কি ভয়ে পশ্চাৎপদ হইল। তখন রমণী যেন শুনিতে পাইল আকাশ হইতে কে বলিতেছে "কল্যাণি! ভীত হইও না। দেবশিশুকে গ্রহণ করিয়া মাতৃবৎ পালন কর। অদ্যাবধি তুমি ইহার মাতা হইলে। শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া একজন মহাপরাক্রমশালী নরপতি হইবে।"

এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সেই দরিদ্র সদেগাপকামিনী শিশুকে নিজ গৃহে আনয়ন করিয়া যথাসাধ্য লালন-পালন করিতে লাগিল। শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মহাবীর হইয়া উঠিলেন এবং স্বীয় ভুজবলে সুবিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। ইনিই পরে রাজা ভল্লুপদ নামে অভিহিত হন। এবং ইহাঁর রাজ্য ভালুকী রাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।

রাজা মহেন্দ্রলাল এই ভল্লুপদ রাজার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, রাজা মহেন্দ্রলালের কন্যা সর্ব্বাংশে আপনার অনুরূপ হইবে।

অনন্তর রণজিৎ তাঁহার কুলপুরোহিতকে রাজা মহেন্দ্রলাল সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা বলিলেন এবং রাজকন্যার বিবাহপ্রস্তাব করিবার জন্য তাঁহাকে ভালুকীর গড়ে প্রেরণ করিলেন।



বিবাহ প্রস্তাব করিবার জন্য পুরোহিতের ভাল্‌কীগড়ে গমন।

রণজিৎ, রাজা মহেন্দ্রলালের পরমলাবণ্যবতী যুবতী কন্যার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয়পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যেরূপ সাহসী, বীর, রণকুশল ও অন্যান্য রাজগুণে বিভূষিত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিবাহপ্রস্তাব যে রাজা মহেন্দ্রলাল অমান্য করিবেন না, তদ্বিষয়ে তিনি স্থিরনিশ্চয় ছিলেন। সেই জন্য স্বীয় কুল-পুরোহিত দুর্গাদাস বাচস্পতিকে যথাযথ শিক্ষা দিয়া ভাল্‌কীর গড়ে পাঠাইয়া দিলেন।

পুরোহিত ভাল্‌কীর গড়ে উপস্থিত হইলে, রাজা মহেন্দ্রলাল পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

বায়ড়ারাজপুরোহিত পণ্ডিতপ্রবর দুর্গাদাস বাচস্পতি রাজা মহেন্দ্রলালকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রাজন্, আমি রাজা রণজিতের কুলপুরোহিত। তাঁহার কুলের হিত-সাধন আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রণজিৎ তাঁহার অনুরূপ কন্যার অভাবে ঐ পর্য্যন্ত অকৃতদার। সম্প্রতি তিনি আপনার রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি আপনার সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা, অপরূপরূপবতী কন্যাকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ

করিতে সম্পূর্ণ অভিলাষী হইয়াছেন। এই সংবাদ আপনাকে জানাইবার জন্য আমি ভালুকীর গড়ে আগমন করিয়াছি। আশা করি, আপনি এই প্রস্তাবে অসম্মত হইবেন না।"

এই বলিয়া রাজপুরোহিত তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

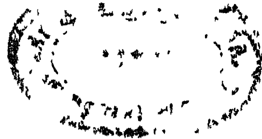
রাজা মহেন্দ্রলাল পুরোহিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল। চক্ষুর্দ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। কিয়ৎক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইলে, রাজা মহেন্দ্রলাল অতিকষ্টে আত্মদমন করিয়া ধীর-গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন—"আপনি ব্রাহ্মণ; আপনার প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে অনুচিত। কিন্তু আপনি যখন রণজিতের দূতরূপে মদীয়-ভবনে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন আপনাকেই সমস্ত কথা বলিতে হইবে। আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

সত্য বটে, রাজা রণজিৎ বঙ্গদেশে একজন অদ্বিতীয় বীর-পুরুষ। বীরত্ব ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য অনেক সদ্‌গুণও আছে। কিন্তু রণজিৎ অজ্ঞাতকুল। তিনি কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তিনি বঙ্গদেশে আগমন করিয়া স্বীয় বাহুবলে রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন। তাঁহার পরাক্রমে আজ মহাশক্তিশালী মুসলমান নরপতি পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত। তাঁহার বীরত্বগৌরবে বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে তাঁহাকে কন্যাদান করা শ্লাঘার বিষয় বলিয়া

মনে হয়। তাঁহার সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইতে কোন্ বঙ্গবাসী না স্পর্দ্ধা মনে করে?

কিন্তু দেব! যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছি—ক্ষমা করুন। আমি অজ্ঞাতবংশ যুবকের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিতে পারিব না। আমি সদ্গোপকুলোদ্ভব। সদ্গোপবংশীয় কোন সম্ভ্রান্ত যুবকের হস্তে কন্যাদান করাই আমার কর্ত্তব্য। অতএব আপনি বায়ড়ায় প্রত্যাগত হইয়া বীরবর রণজিৎকে বুঝাইয়া বলিবেন যে তাঁহার বংশপরিচয় অজ্ঞাত থাকায় মহেন্দ্র তাঁহাকে কন্যা সমর্পণ করিতে পারিল না।”

তালুকীরাজের এবংবিধ বাক্যশ্রবণে দুর্গাদাস বাচস্পতি নরপতিগণের বিবাহসম্বন্ধীয় অনেক শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া মহেন্দ্রলালকে বুঝাইতে লাগিলেন, এমন কি তাঁহাকে ভয় পর্য্যন্ত দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই মহেন্দ্রলাল বিবাহপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।



রণজিৎ কর্ত্তৃক ভাল্‌কীগড় আক্রমণ ও ভাল্‌কীরাজের কন্যাহরণ।

রাজপুরোহিত দুর্গাদাস বিফলমনোরথ হইয়া বায়ড়ায় প্রত্যাগত হইলেন। রণজিৎ পুরোহিতের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। ভাল্‌কীরাজকন্যার রূপে তিনি এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাহার চিন্তাতেই রণজিৎ সমস্ত সময় মগ্ন থাকিতেন। রাজকার্য্য তিনি কোনও প্রকারে সম্পন্ন করিতেন বটে কিন্তু তাঁহার প্রাণ সুন্দরী রাজকন্যার দ্বারা অপহৃত হওয়ায় কোন কার্য্যেই তাঁহার আর বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল না। এতদিন এই রমণীরত্নলাভের আশা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী ছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহাও লুপ্ত হইল।

রণজিৎ পুরোহিতকে সসম্মানে বিদায় দিয়া, কি করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন—"তিনি কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার অনুসন্ধান করিয়া রাজা মহেন্দ্রলালকে সন্তুষ্ট করেন।"

অতি শৈশবাবস্থায় পিতামাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তিনি সন্ন্যাসীর আশ্রমে প্রতিপালিত হয়েন। সন্ন্যাসী ও তাঁহার পরিচারিকাকেই তিনি পিতামাতা জ্ঞান করিতেন। বয়োবৃদ্ধি হইলে নানা বীরকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া রণজিৎ তাঁহার প্রকৃত

বংশপরিচয় অবগত হইতে কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। পালনকারিণী মাতার মুখে তিনি যতদূর শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে তিনি কোন পাপিষ্ঠের ঔরসে কোন ব্যভিচারিণী গৃহস্থকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করায় অতি শৈশবে পিতামাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। সেই জন্য এ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশপরিচয় জানিবার ইচ্ছাই ছিল না। কিন্তু জারজ-পুত্র বলিয়াও নিজেকে বিবেচনা করিতে তিনি অতিশয় লজ্জিত হইতেন। এক্ষণে প্রকৃত বংশপরিচয় অবগত হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া তিনি চতুর্দ্দিকে বিচক্ষণ গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন।

আবার মনে করিলেন—"যদি বংশপরিচয় পাওয়া না যায়, কিম্বা সংবাদ সন্তোষ-জনক না হয়, তাহা হইলেও আমার জীবনসর্ব্বস্ব রমণীরত্নলাভে বঞ্চিত হইব। আর বংশপরিচয় দিয়া রাজা মহেন্দ্রলালের কৃপার ভিখারী হওয়াও বিশেষ অপমানজনক। অতএব যদি বলপূর্ব্বক রাজকন্যাকে গ্রহণ করি তাহাতে দোষ কি? শ্রেষ্ঠ বীরগণইত আবহমানকাল বসুন্ধরা ও সুন্দরী রমণী ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কামিনীকাঞ্চনই এই মেদিনী মণ্ডলে প্রধান ভোগ। ভিখারী কখনও পার্থিবসুখভোগের অধিকারী হইতে পারে না।"

এই সকল চিন্তা করিয়া রণজিৎ রাজা মহেন্দ্রলালের কন্যা-লাভার্থ ভালকীগড় আক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

অধিক লোকক্ষয় না করিয়া ভালকীগড় অধিকার করিবার

আশায় রণজিৎ অল্পসংখ্যক সুশিক্ষিত রণকুশল অশ্বারোহী সমভি-ব্যাহারে মহেন্দ্রলালের রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিশাকালে রণজিৎ সসৈন্যে ভালুকীবগড়ে প্রবেশ করিলেন।

ঘোরা রজনী। দিঙ্মণ্ডল নিবিড়অন্ধকারাচ্ছন্ন। ভালুকীর নরনারী শ্রান্তিহারিণী নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে সুখশায়িত। এহেন সময়ে মহাবীর রণজিৎ প্রাসাদের তোরণদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ প্রাসাদ পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান্ হইল। রণজিৎ আবদ্ধতোরণদ্বারে আঘাত করিবামাত্র প্রহরী সগর্ব্বে চীৎকার করিয়া বলিল, "কে এত অধিক রাত্রিতে দ্বারে আঘাত করিতেছ? নিজের পরিচয় ও প্রয়োজন প্রকাশ করিয়া বল; নচেৎ এখনই শমনভবনে গমন করিতে হইবে"।

রণজিৎ প্রহরীর কথায় কোন উত্তর না দিয়া বারংবার দ্বার-দেশে আঘাত করিতে লাগিলেন। প্রহরী অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রোধান্ধ হইয়া আঘাতকারীকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য নিষ্কোষিততরবারিহস্তে তোরণদ্বার উন্মুক্ত করিল!

দ্বার উন্মুক্ত হইবামাত্র রণজিৎ অদ্ভুত রণকৌশলে মুহূর্ত্তমধ্যে প্রহরীকে নিরস্ত্র করিয়া বন্দী করিলেন। তৎক্ষণাৎ কতকগুলি বীর প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিল এবং রণজিতের আজ্ঞানুসারে উল্লম্ফন দ্বারা দ্বিতল ও ত্রিতলে আরোহণ করিয়া প্রত্যেক কক্ষের দ্বারদেশে চারিজন করিয়া সশস্ত্র বীর দণ্ডায়মান হইল। তখন রণজিৎ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন রাজ-পুরীতে শত্রু প্রবেশ করিয়াছে; সকলে সতর্ক হও।

এই ভীষণ শব্দ শ্রবণে পুরীস্থ সকলেই জাগরিত হইয়া দ্বার উদ্ঘাটিত করিবামাত্র শত্রুহস্তে বন্দী হইল। রাজা মহেন্দ্রলাল শশব্যস্তে যেমন শয়নকক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন, অমনি চারিজন ভীমদর্শন বীর তাঁহাকে বন্দী করিল। তিনি ক্রোধে বিকট চিৎকার করিয়া বলিলেন, পুরীমধ্যে দস্যু প্রবেশ করিয়াছে। রক্ষিগণ, শীঘ্র পাপিষ্ঠদিগকে ধৃত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ কর। চারিজন দস্যু আমার হস্ত ধারণ করিয়াছে।”

রাজা মহেন্দ্রলালের মুখ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র তাঁহার বীরা কন্যা মায়াবতী স্বীয় শয়নকক্ষদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া উলঙ্গ-কৃপাণ-করে অসুরনাশ করিবার জন্য মহামায়ার ন্যায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন।

রণজিৎ রাজকন্যার শয়নাগার পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। তিনি একাকী দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। মায়াবতী দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াই দণ্ডায়মান শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া অসি প্রহার করিলেন। রাজকন্যাচালিত অসি রণজিতের হস্তধৃত চর্ম্মে বাধাপ্রাপ্ত হইল। নিক্ষিপ্ততরবারি পুনরুত্তোলন করিতে না করিতেই মহাবীর রণজিৎ রাজকুমারীর হস্ত ধরিয়া ফেলিলেন।

রাজকন্যা এতই উৎকণ্ঠা ও আবেগপূর্ণ ছিলেন যে তিনি তখন রণজিৎকে চিনিতে পারিলেন না।

হস্তধারণ করিবামাত্র বীরাঙ্গনা রণজিৎকে পদাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, “কাপুরুষ! এই মুহূর্ত্তেই আমার হস্ত পরিত্যাগ কর্। পরস্ত্রীর গাত্রস্পর্শ করা মহাপাষণ্ডের কার্য্য।”

মায়াবতী এই প্রকার ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রণজিৎ বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাকে লইয়া রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। প্রাসাদের বহির্দ্দেশে একজন যোদ্ধা একটী বেগবান্ তুরঙ্গম লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। রণজিৎ প্রাণপ্রিয়া সুন্দরী রাজকন্যা মায়াবতীকে লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অশ্ব তীব্রবেগে 'বায়ড়া' অভিমুখে ছুটিল। তখনও মায়াবতী আততায়ীকে নিদারুণ ভৎর্সনা করিতেছিলেন। রণজিৎ নির্ব্বাক্‌ভাবে তিন চার ক্রোশ অতিক্রম করিলেন। তদনন্তর তিনি অতি ধীর ও কোমলস্বরে মায়াবতীকে আত্মপরিচয় দান করিলেন।

মায়াবতী আততায়ীর পরিচয় পাইয়া লজ্জায়, দুঃখে ও অভিমানে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর তিনি কথঞ্চিৎ আত্মদমন করিয়া রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি ক্রোধে এতক্ষণ এতই অন্ধ হইয়াছিলাম যে আপনাকে চিনিতে পারি নাই। যদিও এক্ষণে অন্ধকার, তথাপি আপনার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি। মহাবীর বলিয়া আপনার উপর আমার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। যে দিন আপনি আমাকে জল হইতে উদ্ধার করেন, সেই দিন হইতেই আমি আপনার চরণে বিক্রীত হইয়াছি। সেইদিন হইতেই মনোমন্দিরে আপনার দিব্যমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া দিবানিশি পূজা করিতেছি। আশা ছিল, একদিন না একদিন আপনাকে লাভ করিয়া সুখী হইব। কিন্তু আপনি অদ্য যে কাপুরুষোচিত কার্য্য করিলেন—তাহাতে আমার জীবনে

এতই ঘৃণার উদয় হইতেছে যে আমার আর জীবনধারণ করিবার ইচ্ছা নাই। যদিই আমার পিতা আমাকে আপনার হস্তে অর্পণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, আপনি নীচ তস্করের কার্য্য না করিয়া প্রকাশ্যভাবে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলেন না কেন? তাহা হইলে স্পর্দ্ধায় আমার বক্ষঃ স্ফীত হইত—আমি মহানন্দে আপনার গলদেশে বরমাল্য দান করিয়া ধন্য হইতাম। হায়! আপনি মোহে মুগ্ধ হইয়া আজ কি করিলেন! আমার জীবনের আশালতা সমূলে উচ্ছিন্ন হইল! আপনি এই স্থানে আমাকে পরিত্যাগ করুন! হতভাগিনী আমি! স্বহস্তে স্বীয় ঘৃণিতজীবন নষ্ট করিয়া শান্তিলাভ করি।"

রাজকন্যার তিরস্কারে রণজিৎ অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়তমে! তুমি আমার জীবনের আরাধ্য দেবতা। যে দিন হইতে তোমার মোহিনীমূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছি সেই দিন হইতেই তোমাকে লাভ করিবার জন্য নানা চেষ্টা করিতেছি। বিবাহপ্রস্তাব করিয়া আমার পুরোহিতকে তোমার পিতার নিকট পাঠাইলাম, তিনি ঘৃণার সহিত তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু তুমি আমার প্রাণের প্রাণ স্বরূপ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছ। তোমার অভাবে বাঁচিতে পারিব না দেখিয়া তোমার পিতার সহিত প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করিতেই মনস্থ করিয়াছিলাম। অনন্তর ভাবিয়া দেখিলাম তোমাকে লাভ করিতে যাইয়া অনেক নিরপরাধ ব্যক্তির, এমন কি তোমার পিতারও প্রাণনাশ হইতে

পারে। সেইজন্য প্রকাশ্যযুদ্ধের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কৌশলে তোমায় লাভ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম! প্রাণেশ্বরি! যদি কোন কুকার্য্য করিয়া থাকি, আমায় ক্ষমা কর। তুমি যখন আমার প্রাণ অতি সঙ্গোপনে চুরি করিতে পারিয়াছ তখন আমি যদি তোমায় চুরি করিয়া লইয়া যাই তাহাতে কি দোষ হইতে পারে? আমিত কাহারও উপর কোন অত্যাচার করি নাই! এই বঙ্গদেশে আমার বীরত্বগৌরব এত সুপ্রতিষ্ঠিত যে অদ্যকার এই কার্য্যের জন্য আমাকে কেহই কাপুরুষ বলিতে সাহসী হইবে না। জীবনসর্ব্বস্ব তুমি আমার—তোমার নিকট আমার আবার দোষ গুণ কি! তুমি ঘৃণা ও অভিমান ত্যাগ করিয়া আমার জীবন ধন্য কর।"

রণজিতের বাক্যে মায়াবতী কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। অশ্ব দ্রুতপদে বায়ড়ারাজ্যে প্রবেশ করিল। রণজিৎ মায়াবতীকে লইয়া প্রাসাদমধ্যে গমন করিলেন। এদিকে রণজিতের সৈন্যগণ রাজা মহেন্দ্রলালের পুরীর সমর্থ ব্যক্তিবর্গকে বন্দীঅবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রুতগতিতে বায়ড়া অভিমুখে প্রস্থান করিল।

চর কর্ত্তৃক রণজিতের পিতামাতার অনুসন্ধান।

নদীতটে নিক্ষিপ্ত শিশু কোন জলচর কিম্বা স্থলচর হিংস্র জন্তু দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া শ্রীমান্ ও সুরূপা নৌকাযোগে পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; তদনন্তর গৃহে গমন করিয়া সমস্ত ঘটনা বৃদ্ধ রাজা নৈঋতকে জানাইলেন। নৈঋত বহুকাল পরে পুত্রকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং পুত্র ও পুত্রবধূর শোক দূর করিবার জন্য তাহাদিগকে অনেক প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পিতার স্নেহে শ্রীমানের মানসিক কষ্ট অনেকটা নিবারিত হইল বটে কিন্তু সুরূপা কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। শিশুপুত্রের জন্য সুরূপা দিবানিশি অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন। প্রফুল্লতা চিরকালের জন্য তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। বিষণ্ণমনে শ্বশুর, স্বামী ও দেবদ্বিজের সেবা করিয়া ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করায় তাঁহার আর সন্তান জন্মিল না।

কালক্রমে বৃদ্ধ রাজা নৈঋত লোকান্তরিত হইলেন। পিতার মৃত্যুতে শ্রীমান্ পুনরায় বিষণ্ণভাব ধারণ করিলেন। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করা তাঁহার পক্ষে অতি কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। অতএব রাজ্যভার এক দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি-ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিয়া তিনি সস্ত্রীক কাশীবাস করিলেন। কাশীধামে তাঁহারা

বিশ্বেশ্বরের পূজা ও ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

একদিন সুরূপা গঙ্গাস্নান করিবার জন্য প্রাতঃকালে ত্রিপুরা-ভৈরবীর ঘাটে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাতীরে গমন করিয়া দেখি-লেন এক নবাগত সন্ন্যাসীকে বেষ্টন করিয়া বহু নরনারী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সুরূপাও সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন এবং পার্শ্বস্থিতা রমণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে সন্ন্যাসী নষ্টবস্তুর সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন।

ইহা অবগত হইয়া সুরূপা সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগি-লেন। বেলা প্রায় দ্বিতীয়প্রহর হইল। ক্রমে ক্রমে সকলেই স্নান করিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। সুরূপা তখনও একা-কিনী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার বিষাদমেঘাচ্ছন্নবদনমণ্ডলস্থ অশ্রুভারাক্রান্তনয়নদ্বয় হইতে দুই এক বিন্দু জল ঝরিয়া পড়িতেছে। সুরূপা নির্ব্বাক ও নিশ্চলভাবে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, সন্ন্যাসীকে কি যেন জিজ্ঞাসা করিবেন মনে করিতেছেন কিন্তু মুখ হইতে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। সন্ন্যাসী বর্ষীয়সী রমণীর এতাদৃশ ভাব নিরীক্ষণ করিয়া অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আপনি বহুক্ষণ বিষণ্ণভাবে এইস্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। আপনার আকৃতি দেখিয়া আপনাকে সম্ভ্রান্তবংশীয়া বলিয়া অনুমান হয়! আপনার যাহা জিজ্ঞাস্য আছে অকুণ্ঠিতভাবে আমাকে বলুন—আমি যথাসাধ্য আপনার প্রশ্নের উত্তর দান করিব।"

সুরূপা সন্ন্যাসীর মিষ্টবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ধীর কোমলকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি আমার স্বামীর সহিত মঙ্গলকোট হইতে পাটনা অভিমুখে আসিতেছিলাম। তৎকালে আমি পূর্ণগর্ভা ছিলাম। পথিমধ্যে একদিন আমার প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। আমরা আর অগ্রসর না হইয়া গঙ্গাতটে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল।"

এই কথা বলিয়াই সুরূপার কণ্ঠরুদ্ধ হইল। অশ্রুবারি গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল। তাঁহার ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল। মুখ হইতে আর বাক্যস্ফুরণ হইল না।

সন্ন্যাসী রমণীর এতাদৃশ অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মা! দুঃখ করিবেন না, বলিয়া যান। আপনার পুত্র, বোধ হয়, জীবিত আছেন।

"আপনার পুত্র বোধ হয় জীবিত আছেন" এই কথা সন্ন্যাসীর মুখ হইতে উচ্চারিত হইবামাত্র সুরূপা ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হইলেন। সন্ন্যাসী অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন এবং নানা প্রবোধবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মা! অত কাতর হইবেন না। বোধ হয়, আপনার দুঃখের অবসান হইয়াছে। আপনি স্পষ্ট করিয়া সমস্ত ঘটনা বলিলেই আমি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিব এবং আপনার প্রশ্নের যথার্থ উত্তরদানে সমর্থ হইব।'

রমণী সন্ন্যাসীর এবম্বিধ বাক্যশ্রবণে আত্মসংযম করিবা

ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "সেই নির্জ্জন স্থানে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে আমার স্বামী স্বীয় হস্তে তাহার নাড়ীচ্ছেদন করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন। অগ্নির উত্তাপে আমি একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, গঙ্গাজলে আমার দেহ ধৌত করিয়া আমাকে নববস্ত্র পরিধান করাইলেন। তৎপরে শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আমি উপবিষ্ট রহিলাম। আমার স্বামী শিশুর আহারার্থ দুগ্ধ সংগ্রহ করিবার জন্য, আমাদিগকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া, নিকটবর্ত্তী গ্রামের উদ্দেশে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই গঙ্গার উপর একটী নৌকা দৃষ্ট হইল। নৌকাখানি তীরসংলগ্ন হইলে কয়েকজন বলবান্ লোক তরী হইতে নামিয়া আসিয়া আমাকে ধরিল। আমি প্রাণভয়ে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় ছিলাম জানি না।

যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম আমি নৌকার উপর শায়িত রহিয়াছি। আমার শিশু পুত্রটী আমার কাছে নাই। শিশুর ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া পাছে কেহ তাহাদের এই কুকর্ম্মের বিষয় অবগত হয়, বোধ হয় এই ভয়ে পাপিষ্ঠগণ শিশুকে আমার ক্রোড় হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া গঙ্গাকূলে ভীষণ জঙ্গলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া থাকিবে। আমি পুনরায় সংজ্ঞাশূন্য হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্যোদয় হইলে আমি কাঁদিতে লাগিলাম।

তদনন্তর আমার স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। তিনি নৌকা অবিলম্বে তীরসংলগ্ন করিতে বলিলেন। নাবিকগণ তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিলে তিনি কর্ণধারকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ

করিলেন। কর্ণধার আহত হইয়া জলে পতিত হইল। অবশিষ্ট নাবিকগণ প্রাণভয়ে গঙ্গায় লাফাইয়া পড়িল।

অনন্তর নৌকাস্বামী ধনুক হস্তে তরণীকক্ষ হইতে বহির্দ্দেশে গমন করিবামাত্র তীরদেশ হইতে এক তীর আসিয়া তাহাকে আহত করিল।

তখন আমার স্বামী সন্তরণ দ্বারা নৌকায় আসিয়া উঠিলেন এবং নাবিকগণকে আহ্বান করিয়া নৌকা পাটনা অভিমুখে চালাইতে বলিলেন।

যে স্থানে দুষ্টগণ শিশুকে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই স্থানে অনেক অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু কিছুতেই আর শিশুকে পাওয়া গেল না। তখন আমরা মনে করিলাম—কোন হিংস্র জন্তু শিশুকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ স্থির করিয়া কাতরপ্রাণে স্বদেশাভিমুখে চলিলাম। যথাসময়ে নৌকা পাটনায় পৌঁছিল। পাটনা হইতে গৃহে গমন করিলাম। আমার শ্বশুর আমাদিগকে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি ইহলোক ত্যাগ করিবার পর আমরা কাশীবাসী হইয়াছি। বাবা! তুমি ত নষ্টবস্তুর সন্ধান বলিয়া দিতে পার শুনিলাম! এখন ঐ পুত্র জীবিত আছে কিনা, যদি জীবিত থাকে তবে কোথায় কি অবস্থায় আছে যদি দয়া করিয়া বলিয়া দিতে পার তাহা হইলে আমি যে কত উপকৃত হই তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি না।”

রমণীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসী সানন্দে উত্তর করিলেন, “মাগো! আপনার পুত্র জীবিত আছেন, তিনি এখন বঙ্গদেশের

অন্তর্গত 'বায়ড়া' নামক জনপদের রাজা"। আসুন্! আপনার স্বামীর নিকট গমন করি। যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমি আপনাদিগকে আপনার পুত্রের নিকট লইয়া যাইতে পারি।"

তদনন্তর সুরূপা সন্ন্যাসীকে লইয়া মহানন্দে স্বামীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সন্ন্যাসীবর্ণিত সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিলেন। শ্রীমান্ অতিশয় আনন্দিত হইয়া সন্ন্যাসীকে স্বীয় আলয়ে স্থান দিলেন এবং ক্রমশঃ জানিতে পারিলেন যে সন্ন্যাসী 'বায়ড়া'রাজ রণজিৎনিযুক্ত চর, প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে।

চর, রণজিতের পিতামাতার সংবাদ লইয়া বায়ড়া গমন করিতে উদ্যত হইলে, শ্রীমান্ ও সুরূপাও তাঁহার সহিত গমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। চর শ্রীমান্ ও সুরূপাকে লইয়া ত্রিবেণীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তথা হইতে উপযুক্ত যানবাহনসাহায্যে রণজিতের পিতামাতাকে লইয়া মহোল্লাসে বায়ড়ারাজ্যে প্রবেশ করিল। শ্রীমান্ ও সুরূপা বহুকাল পরে হারানিধি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। রণজিৎ স্বীয় পিতামাতাকে দেখিয়া এবং তিনি যে উন্নত ক্ষত্রিয় রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ইহা অবগত হইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। রাজ্যমধ্যে আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। জন্মসম্বন্ধে ভ্রমপূর্ণ ধারণাবশতঃ রণজিতের যে মস্তক লজ্জা ও ঘৃণায় অবনত থাকিত সেই মস্তক এক্ষণে স্পর্দ্ধায় ও গৌরবে উন্নত হইয়া উঠিল।

—— * ——



ভাল্কীরাজকন্যা মায়াবতীর সহিত রণজিতের বিবাহ।

ভাল্কীগড়াধিপতি রাজা মহেন্দ্রলাল রণজিতের এই অত্যাচার ও কাপুরুষোচিত দুর্ব্ব্যবহারে অতিমাত্র কষ্ট ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া বঙ্গদেশে তাঁহার আধিপত্যলোপের বাসনায় নিকটবর্ত্তী নৃপতিগণের সহিত সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। বীরবর রণজিতের সহিত একাকী যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করা একপ্রকার অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তিনি ভুরস্থটের মহাপরাক্রান্ত ব্রাহ্মণরাজা সত্যনারায়ণের নিকট রণজিতের অত্যাচার ও দুর্বিনীত ব্যবহারের বিষয় বর্ণনা করিয়া তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছিলেন।

তৎকালে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে ভুরস্থটরাজ অন্যান্য নরপতি বর্গের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তিনি ক্ষুদ্ররাজ্যাধিপ জমীদার শ্রেণীভুক্ত রণজিতের এবম্বিধ আচরণে অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন। রায়ড়া আক্রমণের সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল।

রাজনীতিকুশল মহাবীর রণজিৎ এই ব্যাপার অবগত হইয়া ভীত হইলেন। যাহাতে ভুরস্থটরাজের ক্রোধাপনোদন করিতে পারেন তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগী হইলেন। তদুদ্দেশ্য-সাধনার্থ বঙ্গদেশীয়, বিশেষতঃ ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের প্রধান প্রধান

সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে সাদরে আহ্বান করিয়া একটী মহতী সভার অধিবেশন করিলেন।

রণজিৎ সভাস্থ পণ্ডিতগণের সম্মুখে নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে অতি বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, "হে ভূসুরগণ! দাস, সদ্‌গোপবংশীয় রাজা মহেন্দ্রলালের কন্যার পাণিগ্রহনার্থী হইয়া বিবাহপ্রস্তাব করিয়া তাঁহার নিকট স্বীয় কুলপুরোহিতকে প্রেরণ করে। ভালুকীরাজ মহেন্দ্রলাল আমার বংশপরিচয় অজ্ঞাত থাকায় বিবাহপ্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন। আমিও রাজকন্যার রূপমোহে এতদূর বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম যে একদা নিশাযোগে ভালুকীগড় আক্রমণ করিয়া কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করি। বহু প্রাচীনকাল হইতে এ প্রথা আমাদের দেশে রাজা-দের মধ্যে প্রচলিত আছে। এমন কি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং বীর-কেশরী নরনারায়ণ অর্জ্জুন পর্য্যন্ত বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। আরও ক্ষত্রিয়রাজগণ ব্রাহ্মণেতর ত্রিবর্ণে বিবাহ করিতে সমর্থ। আমি ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব রাজা শ্রীমানের পুত্র। সম্প্রতি আমার পিতা উত্তরবিহারান্তর্গত স্বীয় রাজ্য হইতে বায়ড়ারাজ্যে আগমন করিয়াছেন। দাসের বিনীত প্রার্থনা এক্ষণে আপনারা ভালুকীরাজতনয়াকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণগণ রণজিতের বাক্য শ্রবণান্তর বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলে, বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইল। পরিণয়োৎসবে নিকট-বর্ত্তীনরপতিবর্গ নিমন্ত্রিত হইলেন। রণজিৎ স্বয়ং সর্ব্ব প্রধান

দুইজন পণ্ডিত সমভিব্যাহারে ভূবিশ্রেষ্ঠরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত করিয়া বিবাহকার্য্যে তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর রাজা রণজিৎ ভালুকীরাজ্যে আগমন করতঃ রাজা মহেন্দ্রলালের নিকট স্বীয় বংশপরিচয় প্রদান করিয়া পূর্ব্বকৃত দুর্বিনীত আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ভালুকীরাজ মহেন্দ্রলাল বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণের মত অবগত হইয়া এবং রণজিতের বংশপরিচয় শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন বটে কিন্তু কন্যা ও জামাতার সহিত কোন সংশ্রব রাখিতে সম্মত হইলেন না।"

রাজা মহেন্দ্রলাল বলিলেন, "ক্ষত্রিয়ের সহিত সদ্গোপের কোন সংশ্রব রাখা আমার রুচিবহির্ভূত। আমি জীবন থাকিতে বলিতে পারিব না যে আমার জামাতা ক্ষত্রিয়। তুমি যদি সদ্গোপ বলিয়া নিজের ও পুত্র পৌত্রাদির পরিচয় দিতে পার, সংক্ষেপতঃ তুমি যদি সদ্গোপজাতিভুক্ত হও তাহা হইলেই আমি এই বিবাহ সানন্দে অনুমোদন করিব, নচেৎ তোমাদের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে আমি ইচ্ছুক নহি।"

রণজিৎ প্রিয়তমা মায়াবতীর সন্তোষবিধানার্থ রাজা মহেন্দ্রলালের প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। অনন্তর শুভদিনে শুভক্ষণে তিনি ভালুকীরাজকুমারী নিরুপমসৌন্দর্য্যবতী মায়াবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। সপ্তাহকাল রায়ড়ারাজ্যে ও ভালুকীরাজ্যে আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল।

—— * ——

রাজা রণজিতের দীঘিকাখননের পরামর্শ।

রাজা রণজিৎ সাধ্বী সতী মায়াবতীর সহবাসে পরমসুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বায়ড়ারাজ্য সুখশান্তিপূর্ণ হইল। কিন্তু রাজ্যমধ্যে সুগভীর সরোবর না থাকায় গ্রীষ্মকালে কখনও কখনও প্রজাগণের জলকষ্ট হইতে লাগিল। এই জলকষ্টদূরী-করণমানসে রাজা রণজিৎ একটী সুপ্রশস্ত ও সুগভীর জলাশয় খনন করাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তদনুসারে তিনি বায়ড়ার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে এক সরোবর খনন করাইতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে পুষ্করিণী বিশ হস্ত গভীর খনিত হইলে একটী দেউল বহিষ্কৃত হয়। রাজা রণজিৎ দেউলমধ্যে কোন দেবতার আবির্ভাব আছে অনুমান করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা ঐ পুষ্করিণী পূর্ণ করিয়া দেন। অদ্যাবধি সেই স্থানে পুষ্করিণীর চিহ্ন আছে এবং এখনও উহা দেউলপুষ্করিণী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অনন্তর রণজিৎ গড়ের দক্ষিণ একক্রোশ পরিমিত স্থানে এক প্রকাণ্ড সরোবর খননের মানস করিলেন। পুষ্করিণী খননের সমস্ত আয়োজন হইতেছে এমন সময় নবাবের নিকট হইতে এক দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে—"ঢেকুর নামক গ্রামে ইছাইঘোষ

অত্যন্ত প্রবল হইযা উঠিযাছে। সে গ্রামস্থ ও নিকটস্থ জনগণকে বাধ্য কবিযা বাজকব বন্ধ কবিয়া দিয়াছে। তুমি কালবিলম্ব না কবিযা সসৈন্যে এই বিদ্রোহী গোপনন্দনেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা কব এবং তাহাকে বন্দী কবিয়া আমাব নিকট প্রেবণ কব।"

দূতেব মুখে এই সংবাদ শ্রবণমাত্র সমরপ্রিয বণজিৎ যুদ্ধসজ্জা কবিতে লাগিলেন। দেওয়ান ও পারিষদ্‌বর্গেব উপব বাজ্যরক্ষা ও সঙ্কল্পিত সবোববখননেব ভাব অর্পণ কবিয়া অনতিবিলম্বে সদলবলে ঢেকুব অভিমুখে প্রস্থান কবিলেন।

—: (*) :—

ইছাইঘোষের সহিত যুদ্ধ।
ইছাইঘোষ পরাজিত ও নিহত।

বায়ড়ারাজ বীরপুঙ্গব রণজিৎ সসৈন্যে ঢেকুর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন অবগত হইয়া মহাতেজস্বী ইছাইঘোষ তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রায় পঞ্চশত লাঠিয়াল, তিরন্দাজ ও অসিচর্ম্মধারী বীর লইয়া ঢেকুর হইতে দুই তিন ক্রোশ দূরে এক উন্মুক্ত সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া রণজিতের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রণজিতের গুপ্তচর সন্ধ্যার প্রারম্ভে এই সংবাদ প্রদান করিলে তিনি রাত্রিতে আর অগ্রসর হইলেন না। ঢেকুর হইতে প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে সসৈন্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রণজিৎ কিছুদূরে সদলবলে বিশ্রাম করিতেছেন অবগত হইয়া মহাসাহসী ইছাইঘোষ রজনীযোগেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ভীমপরাক্রমে রণজিতের সৈন্যদলের উপর পতিত হইলেন।

তখন রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। রণজিতের সৈন্যগণ আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছে। অনেকে নিদ্রাঘোরে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে। কয়েকজন প্রহরী তরবারিহস্তে অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান আছে।

ইছাইঘোষের সৈন্যগণ এই অসতর্ক, নিদ্রালস প্রহরিগণের মস্তক ছেদন করিয়া রণজিতের নিদ্রিত সৈন্যগণকে বধ করিতে

লাগিল। এই আকস্মিক বিপৎপাতে রণজিতের সৈন্যগণ নিদ্রোত্থিত হইয়া অস্ত্র গ্রহণ করিল। রজনীর অন্ধকারে শত্রু মিত্র ভেদ করিতে না পারায় মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল।

রণজিৎ তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক মশাল জ্বালিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। মশালের আলোকে রণস্থল আলোকিত হইল। তখন রণকুশল রণজিৎ স্বীয় সৈন্যগণকে সজ্জীভূত করিয়া লইলেন এবং দুর্দ্দম্যতেজে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিলেন। তুমুল-যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। রণজিতের অশ্বারোহী সৈন্যগণ নিমেষমধ্যে অরাতিগণকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল।

ইছাইঘোষ অসিচর্ম্ম লইয়া ভীমবিক্রমে শত্রুনাশ করিতে লাগিলেন। মত্তকরিবর যেমন নলবন পদদলিত করে, তদ্রূপ বীরেন্দ্র ইছাই রণজিতের সৈন্যদলন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল সমরানল ভীষণভাবে প্রজ্জ্বলিত থাকিয়া উভয়পক্ষীয় বহু সৈন্য ভস্মীভূত করিল। ইছাইঘোষের অধিকাংশ সৈন্যই নিহত হইল। অবশিষ্ট যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। কিন্তু তখনও সিংহবিক্রম ইছাই অলৌকিক রণকৌশলে অরাতিনিধনে নিযুক্ত। তাঁহার সৈন্যগণ কোথায়—তাহারা নিহত কি পলায়িত, সে বিষয়ে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। ইছাই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া শত্রুনাশেচ্ছায় অতি ভয়ঙ্কর-ভাবে অসিচালনায় রত।

ইছাইকে বন্দী করিবার জন্য রণজিৎ সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন। কয়েকজন বীর অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া ইছাইএর সম্মুখীন

হইল। কিন্তু অসিযুদ্ধে ইছাইএর হস্তে সকলেই নিহত হইল। তখন বীরকুলকেশরী ইছাইকে বন্দী করিবার আশা পবিত্যাগ কবিয়া রণজিৎ তীব ছুঁড়িলেন। তীরের আঘাতে ইছাইএব প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। রক্তাক্তদেহ ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। রণজিতের সৈন্যগণ বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া ঘন ঘন সিংহনাদ কবিতে লাগিল। রণজিৎ ইছাইঘোষেব মৃতদেহ লইয়া বিজয়িনী-সেনাসমভিব্যাহাবে নবাবের নিকট উপস্থিত হইলেন। নবাব রণজিতের বীরত্বে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোপযুক্ত পুবস্কাব দিলেন।

—*—

রণজিতের দীঘিখনন।

রণজিৎ নবাবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বায়ড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাজা স্বীয় ভবনে প্রত্যাগত হইয়াছেন শুনিয়া প্রজাগণ গৃহে গৃহে আনন্দোৎসব করিতে লাগিল। রাণী ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, অনাথ, আতুরগণকে অন্ন বস্ত্র দান করিতে লাগিলেন। মহাসমারোহে বিশালাক্ষি-দেবীর পূজা হইল। দেবীর পূজাসমাপনান্তে রাজা রণজিৎ দেওয়ান ও সভাসদ্‌গণের সহিত নূতন পুষ্করিণী দর্শন করিতে গমন করিলেন।

গড় পার হইয়াই তিনি পুষ্করিণী দেখিতে না পাইয়া দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ, দীঘি কোথায়?"

দেওয়ান বলিলেন, "রাজন্! গড় পার হইয়াই আপনি দীঘি দেখিতে চাহিতেছেন কেন? আপনার আদেশানুসারে গড়ের একক্রোশ দক্ষিণে দীঘি খনিত হইয়াছে।"

রাজা দেওয়ানের বাক্যশ্রবণে রুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি কি গড়ের একক্রোশ অন্তরে দীঘিখনন করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলাম? আমার অভিলাষ ছিল—গড়ের দক্ষিণে একক্রোশ পরিমিত ভূখণ্ডে 'সরোবর' খনন করা হইবে। আমার কথা ভুল বুঝিয়া একক্রোশ দূরে দীঘি খনিত হইয়াছে। দীঘির

পারসবও অল্প হইয়াছে, আমার ইচ্ছামত হয় নাই। যাহা হউক পুনরায় দীঘি খননের আয়োজন করা হউক।"

দেওয়ান রাজার কথায় অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া এক ক্রোশ পারমিত ভূমির উপর সরোবর খনন করিতে বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিলেন। দীঘিখনন আরম্ভ হইল।

গড়ের একক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত সরোবর এখনও 'ক্রোশ-দীঘি' নামে পরিচিত।

দীঘি খনন আরম্ভ হইলে কোন বিশেষ বাধাবশতঃ রাজা রণজিৎ জ্যোতিষিগণের পরামর্শানুসারে অর্দ্ধক্রোশপরিমিত স্থানের উপর সরোবর খনন করিতে বাধ্য হন। খননকার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে দীঘিমধ্যস্থ ভাণ্ডারের চতুর্দ্দিক ইষ্টকপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হয়। এখনও দীঘির মধ্যস্থলে ঐ প্রাচীর বর্ত্তমান রহিয়াছে।

প্রবাদ আছে, প্রতিষ্ঠাকালে পুষ্করিণীতে 'মাল্‌জাট্' প্রোথিত করিবার জন্য রাজা কর্ম্মকারগণকে জাট্‌কাষ্ঠ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করেন। এইরূপ আজ্ঞা করিবার পর রাজা একদিন নিদ্রাযোগে স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার ইষ্টদেবী তাঁহাকে বলিতেছেন "বৎস! মালজাট আর প্রস্তুত করিতে হইবে না। দ্বারকেশ্বর নদে শাঁখারীর দহে "ফতে খাঁ" ও "কালে খাঁ" নামক দুই মহাশক্তিমান্ জীবন্ত জাট নিমজ্জিত আছে। তুমি নানা উপচারে উক্ত দুই 'জাটের' পূজা করিয়া মহিষ, মেষ, ছাগ বলি দিবে। তদনন্তর বলির রক্ত দহে নিক্ষেপ করিলেই "ফতে খাঁ"

ও "কালে খাঁ।" মহাসন্তুষ্ট হইয়া আপনাআপনি ভাসিয়া উঠিবে। তাহার পর তুমি তাহাদিগকে লইয়া আসিয়া নিজ পুষ্করিণীতে প্রোথিত করিবে।"

নিশাবসানে রাজা লোকজনসমভিব্যাহারে শাঁখারীর দহের দিকে চলিলেন। অনন্তর রাজার আদেশানুযায়ী পূর্ব্বোক্ত ফতেখাঁ ও কালেখাঁর পূজা করিয়া মহিষ, মেষ ও ছাগ বলি দিলেন, বলিদত্তপশুগণের রুধির দহে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দুই প্রকাণ্ড শক্তিমান্ জাট গর্জ্জন করিতে করিতে ভাসিয়া উঠিল। রাজা অনেক স্তুতি, নতি করিয়া জাট দুইটাকে স্বীয় পুষ্করিণীর তীরে আনয়ন করিলেন। রাজা উহাদিগকে সরোবরের মধ্যস্থলে প্রোথিত করিবার জন্য বহু লোকজনের সাহায্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। সুতরাং তিনি অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

সরোবরে 'মালজাট' প্রোথিত করিবার জন্য মহাগোলযোগ হইতেছে এবং এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক সমুপস্থিত হইয়াছে, এমন সময় বিষ্ণুর অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের পরমবন্ধু অভিরাম গোস্বামী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐশীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ অভিরাম জাট ও গোলযোগের কারণ অবগত হইয়া বলিলেন যে তিনি অবলীলা-ক্রমে 'মালজাট' পুষ্করিণীমধ্যে প্রোথিত করিতে পারেন।

এই সংবাদ রাজসমীপে নীত হইলে রাজা কৌতূহল-পরবশ হইয়া অভিরামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং

তাঁহার প্রতিশ্রুত কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন।

দৈববলে বলীয়ান্ শ্রীচৈতন্যসখা অভিরাম 'ফতে খাঁ' নামক কাষ্ঠ উত্তোলন করিতে উদ্যত হইলে ফতে খাঁ তাঁহার পাদদেশে এরূপ আঘাত করিল যে তাঁহার পদতল হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল। জীবন্ত জাটকাষ্ঠের এইরূপ দুর্ব্ব্যবহারে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অনন্তশক্তিশালী অভিরাম কাষ্ঠের উপর পদাঘাত করিয়া তাহার সমস্ত শক্তি অপহরণ করিলেন।

"ফতে খাঁ" তখন নির্জীবের ন্যায় পড়িয়া রহিল। অভিরাম অনায়াসে "ফতে খাঁকে" উত্তোলন করিয়া পুষ্করিণীমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। "ফতে খাঁ" দীঘির মধ্যস্থলে প্রোথিত হইল।

উপস্থিত জনগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। মহাশক্তির বরপুত্র, নির্ভীক রণজিৎ, গোস্বামীর এই অলৌকিক কার্য্য দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে চপেটাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "বেশ, বেশ, তুমি মহাশক্তিমান্! এত লোকের সম্মিলিত চেষ্টায় যাহা সম্পন্ন হয় নাই একাকী তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে! তোমার ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ আমি দ্বিতীয় দেখি নাই।"

——: (*) :——

অভিরামের ক্রোধ।

রণজিতের এইরূপ ব্যবহারে অভিরাম ক্রোধে আত্মহারা হইলেন তাঁহার দেহযষ্টি কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি রোষ-কষায়িত লোচনে রণজিতের দিকে চাহিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। মনে হইল ঐশীশক্তিসম্পন্ন অভিরামের কোপানলে রণজিৎ এখনই ভস্মীভূত হইবে।

অভিরামের কষ্টভাব দর্শন করিয়াও রণজিতের প্রাণে কিছুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল না। তিনি সহাস্যবদনে অভি-রামের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উপস্থিতজনগণ মহাত্রাসে সন্ত্রস্ত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অচল-অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিল। সকলেই মনে করিতে লাগিল আজ মহাপুরুষের অভিসম্পাতে রণজিতের সর্ব্বনাশ হইবে।

অভিরাম যখন দেখিলেন যে তাঁহার সকোপদৃষ্টিতে রণজিতের কোন অনিষ্ট হইল না, তখন তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমার দৈবশক্তি সামান্য মানবীয়-শক্তির নিকট আজ পরাভূত হইল। কত দেবমূর্ত্তি আমার দৃষ্টির তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া বিদীর্ণ ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। আর এই সামান্য মনুষ্য সেই তেজ অবলীলাক্রমে সহ্য করিল। ভগবান্ আজ আমার সমস্ত দর্প চূর্ণ করিলেন। যাহা

হন্টক দেখিতে হইবে, কি শক্তিবলে রণজিৎ আমার দিব্যশক্তিকে অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ হইল।

এই বলিয়া অভিরাম মহাচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি বিকাশপ্রাপ্ত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন—"রণজিৎ সামান্য মানব নহে, মহাশক্তির সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ত্রৈলোকজয়ী। অভয়ার ভয়হারিণী কৃপাদৃষ্টি রণজিতের উপর যতদিন থাকিবে ততদিন তাহার কেশাগ্রস্পর্শ করিতে ত্রিভুবনে কাহারও সামর্থ্য থাকিবে না। এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি নিস্তারিণীর করুণাবারি আজ গর্ব্বোন্মত্ত রণজিৎকে আমার ক্রোধানল হইতে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু এ গর্ব্ব একদিন খর্ব্ব হইবেই হইবে।"

অনন্তর অভিরাম রণজিৎকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তুমি জগদম্বার বরপুত্র। তাঁহারই অনন্তশক্তির কণামাত্র লাভ করিয়া তুমি আজ ত্রিলোকজয়ী। এই দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া তুমি আমার কোপকটাক্ষ হইতে নিস্তার পাইলে। রণজিৎ তুমি ভাগ্যবান্। এক্ষণে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। কিন্তু সাবধান, তুমি পুনর্ব্বার যেদিন মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া কোন মহাত্মার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে, সেই দিনই তোমার দৈবশক্তি লুপ্ত হইবে। সেই দিন হইতেই মহামায়া তোমার উপর বিরূপ হইবেন।"

রণজিৎ সন্ন্যাসীর বাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, "মহাত্মন্! আপনার গাত্রস্পর্শ করিয়া আমি যে

দুর্বিনীত ব্যবহার করিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার শক্তি যে আমার শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী তাহা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। তবে আমার ইহাই বহুভাগ্য যে অনন্তদয়ার উৎসরূপিণী জগজ্জননী সর্ব্বমঙ্গলা মা আমার,—আপনার ধ্বংসকারী ক্রোধবহ্নি হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। ভগবন্! এক্ষণে অধমের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আতিথ্য গ্রহণ করুন।"

অভিরাম কিছুতেই রাজার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন না। তিনি দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় সন্ন্যাসী রাজাকে এই উপদেশ দিয়া গেলেন যে ভগবানের কৃপায় যে মানব বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনে, মানে এই ধরাধামে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে সে যদি অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া তদপেক্ষা নিকৃষ্ট মনুষ্যকে অগ্রাহ্য করে, তবে ভগবান্ বিরূপ হইয়া তাহাকে শক্তিহীন করিয়া দেন। অতএব বলিতেছি—অহঙ্কার ত্যাগ কর, সকল মানবকে প্রেমের চক্ষে দেখিতে শিক্ষা কর, মানীর মান রক্ষা কর, দরিদ্রের দারিদ্র্য দূর কর, জগতের সেবায় জীবন উৎসর্গ কর। ভগবান্ প্রসন্ন থাকিবেন। মানব-জন্ম সার্থক হইবে।

—— * ——

রণজিতের ব্রহ্মশাপ।

রণজিৎ মহাসমারোহে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিন চারি দিন ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও রাজ্যস্থ অন্যান্য প্রজাগণ পরম পরিতোষের সহিত পানভোজনাদি করিতে লাগিল। 'ভুজ্যতাম্ দীয়তাম্' শব্দ অহোরাত্র শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। নানা দিগ্দেশাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যথাযোগ্য স্বর্ণ, রৌপ্য, শাল, বনাত, কাংস্য, ও পিত্তল পাত্র উপহার প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে কয়েক দিন বাগড়া রাজ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। লক্ষ লক্ষ দীন, দরিদ্র, অনাথ, আতুর রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল।

রাজা একদিন সভাসদ্গণপরিবেষ্টিত হইয়া কৃতকর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। অদ্ভুত বীরত্ব, রণদক্ষতা, স্বীয়ভুজবলে রাজ্যলাভ ও দানাদি কার্য্যের জন্য, তাঁহার মনে গর্ব্বের সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহার মনে এই অহঙ্কার জন্মিয়াছিল যে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই।

বহুসাধনার ফলে রণজিৎ যে ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছিলেন, অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়া সেই কৃপা হইতে ক্রমশঃ বঞ্চিত হইতে লাগিলেন। যে মহাশক্তি তাঁহার সাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, আজ তিনি রণজিতের গর্ব্বদর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গত্যাগ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

ভগবৎকৃপা হইতে যতই বঞ্চিত হইতে লাগিলেন, ততই তিনি অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা ও উদ্ধতপ্রকৃতি হইতে লাগিলেন। তিনি বাহুবলে নবাবী সৈন্য পরাস্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার দৈববলের

সম্মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের পার্শ্বচর মহাবিষ্ণুভক্ত অভিরামের ঐশী-শক্তি পরাভূত হইয়াছে বলিয়া তিনি অত্যন্ত আত্মম্ভরী হইয়া উঠিলেন, ধরাকে তৃণজ্ঞান করিতে লাগিলেন। তাঁহার দম্ভের সীমা রহিল না।

কিন্তু দর্পহারী কাহারও দর্প অধিকদিন অব্যাহত রাখেন না। রণজিতের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য ভগবান্ আজ এক কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন। মহাশক্তির বরপুত্র রণজিতের উপর মহাদেবী আজ বিরূপ হইলেন।

উৎসব প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ বায়ড়া ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিয়াছে। কেবল নিকটসম্পর্কীয় কতকগুলি আত্মীয় রাজভবনে তখনও অবস্থান করিতেছিল। একদিন অপরাহ্ণে রাজা রণজিৎ এই আত্মীয়গণে পরিবেষ্টিত হইয়া এক সুন্দরী নর্ত্তকীর মধুর হাবভাব-পূর্ণ নৃত্য দর্শন করিতেছিলেন।

রাজা হরিণনয়না, বিলাসিনী রমণীর লোল কটাক্ষে, মনো-মুগ্ধকর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনায় এত বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি তন্ময়চিত্তে ও একদৃষ্টে নর্ত্তকীর দিকে চাহিয়া ছিলেন এবং সুন্দরীর অশেষ প্রশংসা করিতেছিলেন।

এমন সময় এক জ্বলন্তপাবকতুল্য মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ সভা-স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে "রাজার জয় হউক" বলিয়া রণজিতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

কিন্তু রাজা ব্রাহ্মণের দিকে দৃক্‌পাতও করিলেন না।

ব্রাহ্মণ পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "রাজন্! একজন ব্রাহ্মণ আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য আপনার সম্মুখে উপস্থিত।"

এইবার ব্রাহ্মণের দিকে রাজার ও সভাস্থ বহুব্যক্তির দৃষ্টি পতিত হইল। রাজা অতিশয় বিরক্তির সহিত ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়াই চক্ষুঃ ফিরাইয়া লইলেন।

রাজার এইভাব দেখিয়া কেহ কেহ ব্রাহ্মণের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি কেহ বা তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল।

তখন ব্রাহ্মণ তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রাজন্! বড়ই দুঃখের বিষয় যে আপনি দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া বেশ্যার নৃত্যদর্শনে এতদূর তন্ময় হইয়াছেন যে একজন ব্রাহ্মণ আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান, অথচ আপনি তাঁহাকে আসন পরিগ্রহ করিতে পর্য্যন্ত বলিলেন না, অধিকন্তু বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। যাহা হউক, এখনও আপনাকে ক্ষমা করিয়া বলিতেছি রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দু জাতির উন্নতিকামনায় আপনাকে কিছু উপদেশ দিবার জন্যই এস্থলে উপস্থিত হইয়াছি। আমি অধিক ক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না। এই মূহুর্ত্তেই আপনি সামান্য সময়ের জন্য স্থানান্তরে চলুন। আমি আপনাকে গুটিকত সৎপরামর্শদান করিয়া এখনই চলিয়া যাইব। তৎপরে আপনি যথেচ্ছা নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবন করুন।"

ব্রাহ্মণের এই কথায় রাজা অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ব্রাহ্মণ! তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা যে তুমি

আমাকে তিরস্কার করিতে সাহসী হও। নিরন্ন, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের উপদেশে রাজ্যের আবার কি মঙ্গল হইতে পারে? যাও, এস্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান কর।

ব্রাহ্মণ রাজার কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া কর্কশকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "মূঢ়! তুমি পশুবলে বলীয়ান্ হইয়া পৃথিবীকে তৃণজ্ঞান করিয়াছ; তুমি কি জান না, যে অতি প্রাচীনকালে যখন ভারত জ্ঞানে, ধর্ম্মে ও বলে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত, যখন ভারতের মহাপরাক্রান্ত নরপতিগণ বাহুবলে সসাগরা, সদ্বীপা মেদিনীকে পদানত করিতে সমর্থ হইত, যখন ভারতের গৌরবরশ্মি নিখিল জগৎকে উদ্ভাসিত করিত, তখনও ভারতের নর নারী, ভারতের সমাজ, ভারতের নরপতিগণ ব্রাহ্মণের তিরস্কার অবনতমস্তকে স্বীকার করিত। আর তুমি অতি সামান্য রাজ্যের অধিপতি হইয়া ব্রাহ্মণের পরামর্শগ্রহণে পরাঙ্মুখ! তোমাদের ন্যায় মূর্খ ও যথেচ্ছাচারী রাজার জন্যই ভারত আজ এত হীন হইয়া পড়িয়াছে।

রণজিৎ ব্রাহ্মণের বাক্যে অতিমাত্র রুষ্ট হইয়া অতি রুক্ষস্বরে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, এখনই তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। নচেৎ তুমি বিশেষ রূপে অপমানিত হইয়া বিতাড়িত হইবে।

ব্রাহ্মণের ক্রোধাগ্নি এবার ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বদন-মণ্ডল অরুণবর্ণ ধারণ করিল। চক্ষুর্দ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া সভাস্থ সকলেই প্রমাদ গণিল।

ব্যক্তিস্তোত্ররূপী ব্রাহ্মণ বজ্রানির্ঘোষে বলিতে লাগিলেন "দুর্বৃত্ত! যে দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া তুই সিদ্ধপুরুষ অভিরাম গোস্বামীর ক্রোধানল হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিস্—যে শক্তির মায়ায় আজ তুই অহঙ্কারে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়াছিস্—মহাশক্তির প্রেরণায় আজ তোর সেই শক্তি অপহরণ করিলাম। দেখি—কোন্ শক্তিবলে তুই মহাশক্তির মায়াজাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হ'স্।"

এই অভিশম্পাত প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে রাজসভা পরিত্যাগ করিলেন। সকলেই চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে উপবিষ্ট রহিল। নির্ভীক রাজার হৃদয় সভয়ে ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। মুখ পরিশুষ্ক হইল। গাত্রদাহ হইতে লাগিল। রাজা তেজোহীন হইয়া জড়ের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহার কর্ণকুহরে এই বাক্যই প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল "মহাশক্তির প্রেরণায়, আজ তোর সেই শক্তি অপহরণ করিলাম" এই বাক্যই তাঁহার হৃদয়ে বিষশল্যের ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল—যন্ত্রনায় তাঁহার প্রাণ ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। তিনি সভাভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

রাণী ব্রাহ্মণের অভিশাপের কথা অবগত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে মহামায়ার করুণাভিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অশান্ত রাজাকে নানা প্রবোধবচনে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

রাজা রাণীর প্রবোধবাক্যে বাহ্যিক শান্তভাব অবলম্বন করিলেন বটে কিন্তু তিনি যেন এক নূতন মানুষ হইয়া গেলেন! তাঁহার সে প্রাণ, সে মন আর নাই। তাঁহার সে তেজ, সে বীর্য্য

আর নাই। তাঁহার সে আনন্দ, সে উৎসাহ আর নাই। তিনি যেন এখন জড়ভাবাপন্ন—তাঁহার আনন্দময় উজ্জ্বল হৃদয়ে কি যেন এক ঘোর বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছে। তাঁহার উৎসবপূর্ণ হৃদয় আজ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে—মহাশোকসূচক হাহাকার-ধ্বনি যেন তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে স্বতঃই উদিত হইতেছে। কোন এক ভীষণ আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তিনি এখন সর্ব্বদাই কাতর।

মহাশক্তি রণজিৎকে ত্যাগ করিলেন।

এইরূপ প্রবাদ এখনও বায়ড়া জনপদে প্রচলিত আছে যে একদিন রাজা রণজিৎ কোন গুরুতর রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় অভিনিবিষ্ট আছেন, সভাসদ্‌গণ চিন্তাক্লিষ্টবদনে রাজাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন, দ্বারদেশে দৌবারিক নিষ্কোষিত-তরবারিহস্তে ইতস্ততঃ পাদচারণা করিতেছে। সভাতল নিস্তব্ধ। কাহারও মুখে একটী মাত্র বাক্যও স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। এমন সময় হঠাৎ কিশোরী রাজকন্যা 'সুলোচনা' রাজসভায় উপস্থিত হইল।

ইতিপূর্ব্বে সুলোচনা কখনও রাজসভায় আগমন করে নাই। এক্ষণে নবযৌবনসম্পন্না কন্যাকে সভামধ্যে আগত দেখিয়া রণজিৎ মনে মনে বিরক্ত হইলেন; কিন্তু তিনি কন্যা সুলোচনাকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি সভামধ্যে আসিলে কেন? তুমি এখন বড় হইয়াছ, তোমার এখানে আসা ভাল দেখায় না। যাও, এখনই অন্তঃপুরমধ্যে গমন কর।"

সুলোচনা রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, "পিতঃ! অদ্য আপনার বিলম্ব দেখিয়া আমি সভামধ্যেই আপনার অনুমতি গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইয়াছি।"

রাজা এবার কিছু রুক্ষস্বরে বলিলেন, "এমন কি বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে যে তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে না পারিয়া অনুমতি লইবার জন্য নিজেই নির্লজ্জার ন্যায় সভাগৃহে প্রবেশ করিয়াছ?"

সুলোচনা পিতার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অতিনম্রভাবে উত্তর করিল, "পিতঃ! আমাকে লইয়া যাইবার জন্য শ্বশুরালয় হইতে লোক আসিয়াছে। বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন গুহ্য কারণে আমাকে এই দণ্ডেই শ্বশুরালয়ে গমন করিতে হইবে। আপনার বিলম্ব দেখিয়া আপনার নিকট বিদায় লইবার জন্য সভা-মধ্যে আগমন করিতে বাধ্য হইয়াছি। পিতঃ! আমি যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছি, সানন্দমনে আমাকে বিদায় দিন।"

রাজা কন্যার বচনে কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, "আমি অবিলম্বে অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিতেছি। তুমি এক্ষণে তোমার মাতার নিকট গমন কর।"

এই বলিয়া রাজা পুনরায় রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, সুলোচনাও অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আবার সভাগৃহে গমন করিয়া—সুলোচনা পিতার আজ্ঞা-লাভেচ্ছায় দণ্ডায়মান হইল।

রাজা এবার ক্রুদ্ধ হইয়া কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যাও নির্লজ্জে! অন্তঃপুরমধ্যে গমন কর। আমি অতিশীঘ্রই যথা-কর্ত্তব্য বিধান করিতেছি এবং তোমাকে নিষেধ করিতেছি তুমি প্রাণান্তেও আর সভাগৃহে প্রবেশ করিও না"

সুলোচনা রাজার সরোষবাক্যে যেন ভীত হইয়া পুনর্ব্বার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু পরক্ষণেই রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া যুক্তকরে সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিল, "পিতঃ! আমি আর এক পলও অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমার প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিয়া আমায় বিদায় দিন।"

রণজিৎ এবার ক্রোধে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তিনি রোষকষায়িতলোচনে কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিরস্কার-পূর্ণ-বচনে বলিয়া উঠিলেন, "যাও, পাপিষ্ঠে, এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর হও; এতদূর অবাধ্য সন্তানের মুখদর্শন করিতে ইচ্ছা করি না। যাও, এই মুহূর্ত্তেই আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। আমার গৃহে তোমার আর স্থান নাই"।

সুলোচনারূপধারিণী মহামায়া আজ রাজাকে মায়া-জালে আবদ্ধ করিয়া ছলে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। শবসাধনাকালে রণজিতের উপর প্রসন্ন হইয়া মহাদেবী বলিয়াছিলেন, "বৎস! তুমি যত দিন না নিজমুখে আমায় যাইতে বলিবে, ততদিন আমি তোমার সঙ্গত্যাগ করিব না।"

কিন্তু দর্পের সহিত শক্তি একত্র বাস করিতে পারে না। তাই আজ ছলনা করিয়া দেবী রণজিৎকে পরিত্যাগ করিলেন।

—— * ——

দেবীর গমনে রাজার শোক।

সুলোচনাকে বিদায় দিয়াই রাজার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। নয়নদ্বয় নিষ্প্রভ হইল। তিনি আর সভাগৃহে বসিতে পারিলেন না। কোন এক অনিশ্চিত বিপৎপাতের আশঙ্কায় তাঁহার প্রাণ অধীর হইয়া পড়িল। তিনি সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

রণজিৎ রাণীর প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া অতি ব্যস্তভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুলোচনা কি চলিয়া গিয়াছে?"

রাণী রণজিতের এইরূপ ব্যাকুল ভাব ও হতাশ বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া কোন ভীষণ অনর্থপাতের ভয়ে ভীত হইয়া রাজাকে শয্যার উপর উপবেশন করাইলেন এবং স্বীয় হস্তে রাজার মস্তক-দেশে ব্যজনী সঞ্চালন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! আপনি এত কাতর হইয়াছেন কেন? আপনার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার প্রাণে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। সুলোচনার কথা কি বলিতেছেন? স্পষ্ট করিয়া বলুন—আমি আপনার কথা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।"

রাজা। সুলোচনা কি শ্বশুরালয়ে গমন করিয়াছে?

রাণী। সুলোচনা হঠাৎ শ্বশুরালয়ে গমন কবিবে কেন? আপনি কি বলিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পাবিতেছি না।

রাজা। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সুলোচনা শ্বশুরবাড়ী যাইবার জন্য আমার নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছে।

রাণী। আমিত উহার কিছুই অবগত নহি।

রাজা। এখম সুলোচনা কোথায়?

রাণী। কেন! বাড়ীতেই আছে।

রাজা। তাহাকে শীঘ্র আমার নিকট আনয়ন কর।

বাণী বাজার এইরূপ উন্মত্তভাবদর্শনে মহাত্রাসযুক্ত হইয়া সুলোচনাব সন্ধানে দ্রুতপদে গমন করিলেন এবং শীঘ্র তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাজাব নিকট উপস্থিত হইলেন।

রাজা সুলোচনাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "মা! কিছু মনে করিও না। তুমি সভামধ্যে গমন করিয়াছিলে বলিয়া আমি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি।"

রাজার বাক্যশ্রবনে সুলোচনা যেন আকাশ হইতে পড়িল। সুলোচনা সবিস্ময়ে বলিতে লাগিল, "বাবা! আপনি কি বলিতেছেন? আমি কখন সভামধ্যে গমন করিয়াছিলাম আর আপনিই বা কখন আমায় ভৎর্সনা করিলেন!"

রাজা। কেন মা! তুই কি সব এরই মধ্যে ভুলিয়া গেলি?

এই ত বারংবার সভামধ্যে গমন করিয়া শ্বশুরালয়ে যাইবার জন্য আমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছিলি!

সুলোচনা। বাবা! সত্য করিয়া বলিতেছি আমি রাজ-সভায় একবারও যাই নাই।

রাজা। তুই নিশ্চয়ই গিয়াছিলি। সভাসদ্‌গণ সকলেই তোকে সভা-মধ্যে দর্শন করিয়াছে।

সুলোচনা। না বাবা! আমি সভা-মধ্যে সত্যই যাই নাই। আপনার পাদস্পর্শ করিয়া দিব্য করিতেছি—আপনি আমার কথায় অবিশ্বাস করিবেন না।

রাজা। কি বলিলি, সুলোচনা! তুই রাজসভায় যাস্ নাই! সত্য সত্যই তুই যাস নাই! তবে কি, মা আমার, হতভাগ্য পুত্রকে ছলনা করিল! তবে কি জগদম্বা, তোর রূপ ধারণ করিয়া আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল! সত্য সত্যই কি ব্রহ্মশাপ ফলিল! সত্য সত্যই কি হতভাগ্যের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল! হায়! দগ্ধভাগ্য আমি কি করিলাম! আমার মহাসাধনার ধন—আমার দেহের বল—হৃদয়ের শক্তি—নয়নের জ্যোতিঃ—জীবনের জীবনকে আজ অবহেলায় বিসর্জ্জন দিলাম! আমার এই পাপমুখ আজ অনায়াসে উচ্চারণ করিল, "যাও তুমি এখনই দূর হও—আমার গৃহ হইতে চলিয়া যাও; আমি তোমার মুখ দেখিতে চাহি না। হায়, আমি কি করিলাম! আজ আমার সর্ব্বময়ী মাকে হারাইলাম!

রাজা এইরূপ শোক প্রকাশ করিতে করিতে ক্ষণে ক্ষণে

মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। রাণী সযত্নে রণজিতের সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্তা হইলেন এবং নানা প্রবোধবচনে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করিলেন।

রাণীর পরিচর্য্যায় রাজা একটু সুস্থ হইয়াছেন—এমন সময়ে অন্তঃপুরমধ্যে এক মহা গোলযোগ উত্থিত হইল। কতকগুলি পরিচারিকা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বহির্ব্বাটী হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিল "হায় কি হইল, বাজার তিরস্কারে বাজকন্যা সুলোচনা বড় দীঘির জলে ডুবিয়াছেন।

এক জন শাঁখারী তাঁহাকে শাঁখা পরাইয়া দিয়া দামেব জন্য বাজবাটীতে আসিয়াছে।"

রাজার কর্ণে যেই এই কথা প্রবেশ করিল অমনি তিনি অতি ব্যস্তভাবে শাঁখারীর উদ্দেশ্যে বহির্বাটীতে গমন কবিলেন এবং শাঁখারীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কাহাকে শাঁখা পরাইয়াছ?"

শাঁখারী। মহারাজ! রাজকন্যাকে শাঁখা পরাইয়াছি।

রাজা। তুমি কিরূপে জানিলে সে রাজকন্যা?

শাঁখারী। তিনি নিজেই বলিলেন—আমায় শাঁখা পরাইয়া দাও, আমি তোমাদের রাজার কন্যা। বাবা আমায় তিবস্কার করিয়াছেন তাই একাকিনী দীঘিতে স্নান করিতে যাইতেছি।

রাজা শঙ্খবণিকের বাক্য শ্রবন করিয়া অতি উত্তেজিত ও অধীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, "বল, বল শাঁখারী শীঘ্র বল—তুমি শাঁখা পবাইয়া দিবার পর রাজকন্যা কি করিল?"

শাঁখারী যুক্তকরে, সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিল, "মহারাজ! তেমন রূপ আমি মানুষে কখনও দেখি নাই। মা যখন বলিলেন —শাঁখারী আমায় শাঁখা পরাইয়া দাও, তখনই নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিয়া মায়ের দুইটী হাতে সাগ্রহে শাঁখা পরাইয়া দিলাম।

আমার যেন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। মায়ের দিব্যমূর্ত্তির দিকে নির্ণিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলাম। মা আমার শাঁখা পরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"শাঁখারী, দামের জন্য অপেক্ষা করিতেছ? আমি স্নান করিতে যাইতেছি। আমার নিকট অর্থ নাই। তুমি রাজার নিকট গমন কর। তিনি আমার পিতা। তাঁহার নিকট যাইয়া, এইসব কথা বলিলেই তিনি তোমায় দাম দিবেন।"

আমি বলিলাম—"মা গো! আমি আপনাকে শাঁখা পরাইয়া দিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আমি আর শাঁখার দাম লইব না।" আমার কথা শুনিয়া তিনি জেদ করিয়া বলিলেন—"না, তুমি রাজার নিকট যাইয়া দাম লইতেই চাও। নচেৎ আমি তোমার উপর অসন্তুষ্ট হইব।"

এই কথা বলিয়াই জগদ্ধাত্রীরূপিণী মা আমার, মরালগমনে দীঘিতে অবতরণ করিলেন। আমি তন্ময় হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। আমার হৃদয় কি এক অননুভূতপূর্ব্ব দিব্য-ভাবে পূর্ণ হইল। আমি কিছুতেই চক্ষুঃ ফিরাইতে পারিলাম না। দেখিতে দেখিতে মা আমার আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইলেন। কেবল

মায়ের সুন্দর মুখখানি প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় সরোবরের স্বচ্ছ-জলে ভাসিতে লাগিল। ক্ষণপরে তাহাও জলে ডুবিল।

ডুব দিয়া মা আমার, আবার উঠিবেন—এই আশায় সরোবরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এইরূপ উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমিও সরোবরের জলে নামিলাম। জলে ডুবিয়া যথাসাধ্য মাকে অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু হায়! মাকে আর দেখিতে পাইলাম না।

শঙ্খবণিকের এই কথা শ্রবন করিয়া রাজা উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বণিক তুমিই ধন্য—জগজ্জননী মহামায়াকে দর্শন ও স্পর্শন করিয়া তোমার মানবজন্ম সার্থক হইল! চল, চল, বণিক! একবার সরোবরতীরে গমন করিয়া দেখি—মা আমার কোথায় নিমজ্জিত হইয়াছেন! এই কথা বলিতে বলিতে রাজা বণিককে সঙ্গে লইয়া সরোবরের দিকে প্রস্থান করিলেন। অনেকেই রাজার অনুসরণ করিল। পাছে রাজা সরোবরজলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন এই ভয়ে রাণীও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন।

রাজা সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়া সাশ্রুনয়নে, গদগদ-বচনে বলিতে লাগিলেন, "মা গো! ছলনা করিয়া আজ তুমি আমায় ত্যাগ করিলে! বুঝিয়াছি—আমারও জীবনের কার্য্য শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমিও শীঘ্রই তোমার অনুগমন করিব। তবে মা, আমার বড় আশা—এই শাঁখারীর নিকট শাঁখা পরিয়া তুমি কেমন সাজিয়াছ, তাহা একবার স্বচক্ষে দর্শন করি।"

রাজার মুখ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র শঙ্খশোভিত দুইখানি মৃণালগঞ্জিত হস্ত সরোবরের মধ্যস্থলে উত্তোলিত হইল। সকলে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শঙ্খবণিক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। রাজা একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে প্রাসাদাভিমুখে গমন করিলেন।

— x —



পুত্রহস্তে রণজিতের রাজ্যভার অর্পণ।

রাজা গৃহে আগমন করিয়া শয্যাগত হইলেন। তাঁহার আহার প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল, দেহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল। চক্ষু কোটরগত হইল। উজ্জ্বল বদনমণ্ডল দীপ্তি হারাইল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় দিবানিশি "মা, মা" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

তাঁহার চিকিৎসার জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে রোগপ্রতীকার-বি-দক্ষ বৈদ্যগণ আসিতে লাগিল। রাণী আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্বহস্তে রাজার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! কিছুতেই কিছু হইল না। বৈদ্যগণ রোগ নির্ণয় করিতে পারিল না। ক্রমে ক্রমে তাহারা হতাশ হইয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

ক্রমশঃ রাজার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। তাঁহার জীবনের আর কোন আশাই রহিল না। স্বামীর আরোগ্যলাভের আর কোন আশা নাই দেখিয়া রাণী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। অনন্তর তিনি বিশালাক্ষীদেবীর শরণাপন্ন হইলেন। রাণী দেবীর মন্দিরে গমন করিয়া 'হত্যা' দিলেন। রাণী তিন দিন অনাহারে অর্দ্ধমৃতার ন্যায় মন্দিরদ্বারে পতিতা রহিলেন। তৃতীয় দিবস রজনীশেষে তিনি যেন শুনিতে পাইলেন-দেবী বলিতেছেন—"বৎসে! এই মরধামে

তোমাদের কার্য্য শেষ হইয়াছে। সেই জন্যই আমি রাজাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। তুমি আর বৃথা রাজার জীবনভিক্ষা করিও না। যাও, সুরাসুরবাঞ্ছিত অমরধামে গমন করিবার আয়োজন কর। শোকদুঃখ হৃদয় হইতে দূরীভূত কর। স্বামীসহ দেবলোকে বাস করিয়া চিরানন্দ লাভ কর।"

এই দৈববাণী শ্রবন করিয়া রাণী উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার শোকদুঃখ দূর হইল। ক্ষীণহাস্যরেখা তাঁহার শীর্ণ ও পবিত্র বদনমণ্ডলে শোভা পাইতে লাগিল। তিনি মন্দির ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে স্বামীসকাশে উপস্থিত হইলেন। রাজা সাধ্বীসতী সহধর্ম্মিনীকে তিন দিন পরে নয়নগোচর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন. "প্রিয়তমে! আমার এই অন্তিমকালে আমাকে ছাড়িয়া তুমি কোথায় গিয়াছিলে?" রাজাব কথা শুনিয়া রাণী বলিলেন, "জীবিতেশ্বর! আপনার জীবনভিক্ষা করিবার জন্য বিশালাক্ষী-মন্দিরে 'হত্যা' দিয়াছিলাম। কিন্তু মা বলিলেন "এই পৃথিবীতে তোমাদের কার্য্য শেষ হইয়াছে। তোমরা দিব্যধামে গমন কবিবার উদ্যোগ কর। মায়ের এই অভয় বাণী আপনাকে বলিবার জন্য মন্দির হইতে দ্রুতগতিতে আগমন করিতেছি।"

রণজিৎ রাণীর মুখে দৈববাণী শ্রবন করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইলেন। সস্ত্রীক স্বর্গধামে গমন করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে রাজা গুরু, পুরোহিত, অমাত্যবর্গ ও রাজ্যস্থ সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা রাজসমীপে

উপস্থিত হইলে রাজা অতি বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। জগদ্ধাত্রী মা আমার, আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মাকে ছাড়িয়া আমি আর জীবনধারণ করিতে পারিব না।

দেবীর নিকট আমার জীবনভিক্ষা করিবার জন্য রাণী বিশালাক্ষীর মন্দিরে 'হত্যা' দিয়াছিল। গত যামিনীর শেষ যামে রাণীর প্রতি দৈববাণী হইয়াছে যে এই পৃথিবীতে তোমাদের কার্য্য শেষ হইয়াছে, বৃথা শোক পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরগমনে উদ্যোগী হও।

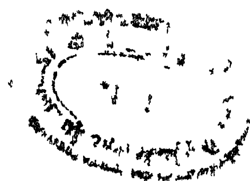
এক্ষণে আমার অভিলাষ কুমার অচ্যুতানন্দকে, রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাহার হস্তে রাজ্যশাসনভার অর্পণ করি এবং আপনারাও কোমলমতি কুমারকে এই গুরুভারবহনে সাহায্য করেন; তাহা হইলেই আমি নিরুদ্বেগে ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে মাতৃসাযুয্যলাভে সমর্থ হই।"

রাজার বাক্যশ্রবনে সকলেই নিদারুণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রাজন্! আমরা অতি হতভাগ্য। তাহা না হইলে আপনার ন্যায় মহাপরাক্রমশালী প্রজাবৎসল রাজাকে আজ অকালে হারাইব কেন? যাহা হউক, আপনি যখন কুমার অচ্যুতানন্দকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তখন আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার প্রস্তাব অনুমোদন করিলাম। আর আপনার আদেশক্রমে কুমারকে রাজকার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইলাম।"

রাজা রাজ্যস্থ প্রধান ব্যক্তিগণের মুখে এই বাক্য শ্রবন করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। তৎপরে তিনি গুরুদেবের চরণধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "গুরুদেব! আপনি একটী শুভদিন নির্ব্বাচন করিয়া অচ্যুতানন্দকে শীঘ্র রাজ্যে অভিষিক্ত করুন। কারণ আমার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই এ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইবে।"

অনন্তর এক শুভদিনে শুভক্ষণে কুমার অচ্যুতানন্দ সিংহাসনারোহণ করিলেন। দুঃখের মধ্যেও রাজ্যে আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই সানন্দে অচ্যুতানন্দকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন।

—*—



সরোবর-নীরে রণজিতের প্রাণত্যাগ।

চৈত্র মাস। মেদিনী ফুলসাজে সজ্জিত হইয়া সুমধুর হাস্য করিতেছে। যেন প্রাণপ্রিয় স্বামীকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্যই ধরারাণী সুগন্ধিকুসুমাভরণে বিভূষিতা হইয়াছেন। পিকবধূ সুমধুর কুহুতানে মিলনগীতি গাহিতেছে। মলয়পবন ধরানাথকে সোহাগ-ভরে ব্যজন করিবার জন্যই যেন মৃদু মৃদু সঞ্চালিত হইতেছে। আজ মহাবারুণী। পৃথিবীপতি রাজেন্দ্র রণজিৎ স্বখাদসরোবরতটে সমানীত। লক্ষ্মীরূপিণী, পতিব্রতা রাণী রাজার পার্শ্বচারিণী। ব্রাহ্মণগণ রাজদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য দীর্ঘিকাকূলে সমুপস্থিত। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই অপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দর্শন করিবার মানসে সাগ্রহে সমাগত।

রাজা ধীরে ধীরে উপবেশন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিলেন এবং সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। সমাগত জনগণ দুর্ব্বিষহদুঃখে বক্ষঃ বিতাড়ন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। রাজা সকলকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "সর্ব্বপাপবিনাশিনী, পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর ব্রহ্মদ্রববারিমধ্যে অর্দ্ধদেহ নিমজ্জিত করিয়া যদি মানব বহুকঠোরসাধনাবলে জীবনত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, তবে আর তাহাকে এই পাপতাপপূর্ণ মরধামে পুনরাগমন করিতে হয় না। কিন্তু এই সরোবর-নীর গঙ্গাজলের সমতুল্য। কারণ জগজ্জননী

জগদ্ধাত্রী শিবমনোমোহিনী মা আমার, এই সরোবরনীরমধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছেন। ব্রহ্মময়ীর চরণস্পর্শে এই জল পরম পবিত্রতা লাভ করিয়া পাপতাপ ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছে। অতএব আমি এই সরোবরের পবিত্র সলিলে দেহত্যাগ করিয়া কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হইব।"

এই বলিয়া রণজিৎ দীঘির জলে কণ্ঠ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাণী রাজাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া তাঁহার বামপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। উপস্থিতজনগণ কালভয়বারিণী কালীর অভয়নামে দিগন্ত পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। রাজা ভক্তিগদগদ-কণ্ঠে, মা! মা! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। রাণীর মস্তক রাজার স্কন্ধদেশে ধীরে ধীরে ঢলিয়া পড়িল। ক্রমশঃ রাজার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। অচ্যুতানন্দ রাজাকে ধরিয়া বসিলেন। রাজবধূ ও রাজকন্যা রাণীকে ধরিয়া রহিলেন। রাণীর ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে লাগিল। চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধ-নিমীলিত হইল। রাণী স্বামীকে অতি ধীরে ধীরে বলিলেন, "স্বামিন্! প্রভো! জীবনমরণের সহচর! আমি চলিলাম। তুমি আইস।" এই কথা বলিতে বলিতেই রাণীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া মহাকাশে বিলীন হইল।

সকলেই হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাজা অতি মৃদু-ভাবে বলিলেন, "সতী-সাধ্বী তুমি, অগ্রবর্ত্তিনী হইলে! তুমিই পতিব্রতা রমণীকুলের আদর্শস্থানীয়া। নহিলে স্বামীকে আলিঙ্গন

করিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে প্রাণত্যাগ কবিতে কখনও সমর্থ হইতে না। আমার পবম সৌভাগ্য যে তোমা হেন বমণী-রত্নকে সহধর্ম্মিনীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। যাও প্রিয়তমে! স্বর্গরাজ্যে গমন কর। দেবিগণ তোমাব সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য অম্লানকুসুমহার হস্তে লইয়া ত্রিদিবদ্বাবে অপেক্ষা করিতেছেন।"

এই বলিতে বলিতে বাজার নয়নদ্বয় স্থিব হইয়া আসিল। অধরপ্রান্তে ক্ষণে ক্ষণে হাস্যরেখা দৃষ্ট হইল। 'জয় মা!' বলিয়াই রাজা অচ্যুতানন্দের স্কন্ধের উপর ঢলিয়া পড়িলেন। চতুর্দ্দিক হইতে 'গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' রব সমুত্থিত হইতে লাগিল। রাজা শোকদুঃখপূর্ণ মরধাম ত্যাগ করিয়া জরামরণবর্জ্জিত অমর-নিকেতনে প্রবেশ কবিলেন।

অদ্যাবধি চৈত্রমাসে বারুণীর দিনে সহস্র সহস্র নরনারী এই সরোবরে স্নানার্থ সমাগত হয়। এখনও এই প্রকাণ্ড জলাশয় রণজিৎ রায়েব 'দীঘি' নামে প্রসিদ্ধ থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আজ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবভিক্ষুকগণ বারুণীব মেলায় মহামায়ার শাঁখাপরানর গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে।

বঙ্গবাসী আমরা, ভীরু কাপুরুষ বলিয়া পৃথিবীতলে পরিচিত। আমাদের দেহে বল নাই, মনে উৎসাহ নাই, হৃদয়ে প্রেম নাই। আমরা জীর্ণ-শীর্ণ দেহে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিবার আশায় উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া, দাসত্বই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য মনে করিয়াছি। আমরা দীনতা ও হীনতার প্রতিমূর্ত্তি হইয়া পড়িয়াছি। উদারান্নসংস্থানরূপ সামান্য স্বার্থের জন্য আমরা

কত না অকার্য্য কুকার্য্য করিতে অগ্রসর হইতেছি। পথপার্শ্বে নিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্টান্নভোজনের জন্য কুক্কুরগণ যেমন পরস্পর মারামারি করিয়া পরস্পরকে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করে, আমরাও তদ্রূপ পরপ্রসাদলাভার্থ আপনাআপনি বিবাদ-বিসম্বাদে নিযুক্ত হইতে কুণ্ঠিত হই না। এখন আর আমাদের নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার শক্তি নাই। এই রত্ন-প্রসূ দেবভূমি ভারতবর্ষে জন্ম-গ্রহণ করিয়া এখন আর আমরা স্বাধীন কার্য্য দ্বারা আত্মজীবন রক্ষা করিতে সমর্থ নই। আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, আমাদের উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষা, এখন আর পরপদসেবা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না—যে দেশে কিছুকাল পূর্ব্বে প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, রণজিৎ প্রভৃতি স্বাধীনচেতা কর্ম্মবীরগণ আবির্ভূত হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের বংশধর আমরা, পরপদলেহী কুক্কুরাধমের ন্যায় ঘৃণিতজীবনযাপন করা কতদূর লজ্জাজনক।

অতএব পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া তুলিবার জন্য, স্বীয় স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য, পৃথিবীর কোন সভ্যজাতি অপেক্ষা আমরা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নই—বুঝিবার জন্য, চল একবার বারুণীর দিনে বঙ্গবীরকুলকেশরী রণজিৎ রায়ের লীলা-নিকেতন 'রায়ড়ায়' গমন করিয়া তাঁহার অতীত গৌরবের সাক্ষীস্বরূপ নানা কীর্ত্তিচিহ্ন দর্শন করিয়া ধন্য হই!

—— * ——

বঙ্গের মুসলমান্ রাজা জেলালুদ্দিনের সহিত রণজিতের পৌত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রের ঘোরতর যুদ্ধ ও বায়ড়া রাজ্য বিধ্বস্ত।

রণজিতের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অচ্যুতানন্দ প্রায় দ্বাদশবর্ষ নির্বিঘ্নে ও পরম গৌরবের সহিত বায়ড়া রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বায়ড়া রাজ্য অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। প্রজাগণ সুখে ও শান্তিতে জীবিকা নির্বাহ করিতে সমর্থ হইত। তৎকালে দেশে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

রাজা অচ্যুতানন্দ রাজ্যের নানা মঙ্গলসাধন করিয়া পরলোক গমন করিলে তদীয় ধার্ম্মিক পুত্র রামসদয় রাজ্যলাভ করেন। ইনি একজন অত্যন্ত দানপ্রিয় নরপতি ছিলেন। রাজা রামসদয় প্রতি বৎসর বারুণীর দিন রাজ্যস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণকে ধন রত্ন ও বস্ত্র দান করিতেন। রাজার এই দানসাহায্যেই বায়ড়াজন পদবাসী ব্রাহ্মণগণ স্বীয় স্বীয় পরিবার প্রতিপালনে সমর্থ হইতেন। তৎপরাদবস বায়ড়াধিপতি উদারচেতা রামসদয় রায়—বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী ও মুসলমান্ ফকিরগণকে রণজিৎ রায়ের দীঘির চতুঃ

পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগে বসাইয়া চর্ব্ব, চূষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি নানাবিধ সুখাদ্য ভোজন করাইতেন এবং তাহাদের প্রত্যেককে এক একখানি করিয়া কম্বল দিতেন এবং তৃতীয় দিবস দুঃখী, কাঙ্গালিগণকে পরম উপাদেয় খাদ্যে পরিতুষ্ট করিয়া প্রত্যেককে এক একখানি বস্ত্র দান করিতেন। রাজা রামসদয় এইরূপে বারুণীর দিন হইতে আরম্ভ করিয়া দিবসত্রয় রণজিতের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বহু অর্থদায় করিতেন। ঐ সময়ে দীঘির তটদেশ অন্নপূর্ণার লীলাক্ষেত্র বলিয়া অনুমান হইত।

এইরূপে নানা পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া রাজা রামসদয় পরলোকগত হইলে তাহার দুই ভ্রাতা কালিকিঙ্কর ও ধনঞ্জয় ক্রমান্বয়ে রায়ড়া রাজ্য শাসন করেন। রাজা ধনঞ্জয়ের মৃত্যু হইলে রামসদয়ের পুত্র হরিশ্চন্দ্র সিংহাসনারোহণ করিলেন।

তিনি অতিশয় গর্ব্বিত ও উগ্রস্বভাব ছিলেন। রণজিতের ন্যায় বীরপুরুষ ও রণকুশল হইলেও হরিশ্চন্দ্র তাঁহার ন্যায় রাজনীতি-কুশল ও লোকপ্রিয় ছিলেন না। তাহার উদ্ধত ব্যবহারে অধিকাংশ প্রজা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ছিল। রণজিতের আদেশে প্রজাগণ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইত না কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের উপর তাহারা এতদূর বিরক্ত ছিল যে রাজ্যের মঙ্গলের জন্যও তাহারা রাজার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে আগ্রহান্বিত হইত না।

রাজাও অনেক সময় পশুবল প্রয়োগ করিয়া প্রকৃতিবর্গকে বাধ্য রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তজ্জন্য রাজ্যের বহু সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তি তাঁহার শত্রু হইয়া উঠেন এবং গোপনে গোপনে তাহার ধ্বংসসাধন করিতে চেষ্টা করেন।

প্রজাগণকে দমনে রাখিবার জন্য তিনি সৈন্যবল বৃদ্ধি করেন। কথিত আছে, তাঁহার একশত রণহস্তী, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, ও দশ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। রাজা স্বয়ং সেনাপতির কার্য্য করিতেন।

ক্রমশঃ রাজা হরিশ্চন্দ্র এতদূর বলদৃপ্ত হইয়া উঠেন যে তিনি বঙ্গেশ্বর জেলালুদ্দিনকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন নরপতিরূপে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করেন এবং একটী খণ্ডযুদ্ধে জেলালুদ্দিনের সৈন্যগণকে পরাস্ত করেন। এই বিজয়লাভে রাজা হরিশ্চন্দ্র এত অহঙ্কারোন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি স্বীয় রাজ্যবৃদ্ধি করিবার মানসে মুসলমানাধিকৃত দেশ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন।

জাহানাবাদের নিকটবর্ত্তী এক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে নবাবীসৈন্য হিন্দুসৈন্যের সম্মুখীন হয়। উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া উঠে। এই যুদ্ধে রাজা হরিশ্চন্দ্রের অদ্ভুত বীরত্বে ও রণকৌশলে মুসলমানসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়।

এবার বঙ্গেশ্বর জেলালুদ্দিন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। নবাব বায়ড়া আক্রমণের জন্য প্রভূত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেকন্দর খাঁ নামক এক সুদক্ষ বীরকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করেন।

নবাবের উপদেশানুসারে সেকেন্দর খাঁ সসৈন্যে ভূবিশ্রেষ্ঠ

বা. ়ের একটি প্রধান নগর রাজবলহাটে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ শিবনারায়ণ নবাবের সহিত বিবাদ মিটাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া হরিশ্চন্দ্রের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

দূত রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—"রাজন! ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা আপনি নবাবের সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করেন। কারণ মুসলমান-শক্তি এক্ষণে এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে তাহার উচ্ছেদসাধন করা এক প্রকার অসম্ভব। অতএব অনর্থক যুদ্ধে বহুলোকক্ষয় ও অর্থক্ষয় রাজনের সমীচীন বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন না। আর আপনি যদি নবাবের সহিত সন্ধি না করেন তাহা হইলে ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ আপনার কোন সাহায্য করিতে পারিবেন না।"

দূতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন—তিনি অতিকর্কশস্বরে দূতকে বলিতে লাগিলেন,—"যাও দূত—শীঘ্র আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও। ভীরু শিবনারায়ণকে বলিও—রাজা হরিশ্চন্দ্র দুর্বলহস্তে অসি ধারণ করে নাই। সে কাহারও সাহায্যপ্রত্যাশী নহে। জন্মভূমির উদ্ধারসাধনের জন্য যে অসি নিষ্কোষিত হইয়াছে তাহা শত্রুরুধিরে রঞ্জিত না হইয়া কখনই কোষবদ্ধ হইবে না। তোমার কাপুরুষ রাজাকে বলিও, রাজা হরিশ্চন্দ্র স্বীয় বীর্য্যবলে হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী মুসলমানগণকে বঙ্গদেশ হইতে হয় বিতাড়িত

করিবে, না হয় জননীজন্মভূমির জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া অমরধামে গমন করিবে। যে হিন্দুকুলাঙ্গার জীবিত থাকিয়া হিন্দু-ধর্ম্ম, হিন্দু-দেবদেবী এবং গো, ব্রাহ্মণ ও হিন্দু-রমণীর উপর অত্যাচার দর্শন করে, তাহার জীবনে শত ধিক্! সে কুক্কুরাধম দেশের শত্রু অপেক্ষাও অধিকতর ভয়াবহ।

যাও দূত, শীঘ্র তোমার প্রভুর নিকট গমন করিয়া বল গে, যে রাজা হরিশ্চন্দ্র বঙ্গদেশ হইতে মুসলমান্‌গণকে বিদূরিত করিয়া ব্রাহ্মণকুলকলঙ্ক দেশদ্রোহী শিবনারায়ণকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করিতে কখনও বিস্মৃত হইবে না।"

এই বীরোচিতবাক্য শ্রবণ করিয়া দূত পায়ড়া পরিত্যাগ করিলে রাজা হরিশ্চন্দ্র আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "হায়! মা ভারতভূমি! তোমার পুত্রগণ বলবীর্য্যহীন বলিয়া তুমি আজ মুসল্‌মান্‌পদানত নহ। তাহারা আত্মপ্রত্যয়হীন। যদি ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ শিবনারায়ণ স্বীয় শক্তির উপর বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে বোধ হয় সে একাকীই বঙ্গদেশ হইতে মুসল্‌মান্‌গণকে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইত। জন্মভূমির পরাধীনতা-শৃঙ্খল উন্মোচন করিতে নিজে চেষ্টা করা দূরে থাক্ সে আমাকে পর্য্যন্ত নিরুৎসাহ করিতে যত্নবান্। বঙ্গদেশীয় হিন্দুনরপতিগণ সম্মিলিত হইয়া যদি আজ মুসল্‌মান্‌বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই আবার স্বাধীনতাসূর্য্য বঙ্গগগণভালে উদিত হইয়া সুখময়-উজ্জ্বল-কিরণ-জালে দুঃখান্ধকার দূরীকরণে সমর্থ হয়।

কিন্তু হায়! সে একতা ভারত হইতে বহুকাল বিদায়

গ্রহণ করিয়াছে। ভারত আজ বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা ও বল-বীর্য্যে পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও সেই একমাত্র একতার অভাবেই পরপদানত, লাঞ্ছিত ও ধিক্কৃত। যদি ভারতের নরপতিগণ নীচস্বার্থান্বেষী না হইয়া পরমপবিত্রএকতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে কি মহম্মদ ঘোরী বীরকুলগৌরব দিল্লীশ্বর পৃথ্বিরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দেবভূমি ভারতবর্ষে মুসল্‌মান্‌ রাজ্যস্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারিত!

হে ভারতবাসী! একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ—তোমরা কে? কোন মহান্‌ বংশে তোমাদের উৎপত্তি! তোমাদের তুলনায় মুসল্‌মানগণ কিছুতেই শ্রেষ্ঠ নহে। আর সময়ক্ষেপ করিলে মুসলমান-রাজ্য এতই বদ্ধমূল হইয়া পড়িবে যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহার মূলোৎপাটন করিতে সমর্থ হইবে না।

জননী ভারতভূমির জন্য একবার হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া যাও, একবার নিজ নিজ শক্তির উপর বিশ্বাস কর, একবার মহামাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সম্মিলিত শক্তিতে দেশবৈরীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর, দেখিবে তোমাদের জ্বালাময়ী মহাশক্তির সম্মুখে মুসল্‌মানগণ পতঙ্গবৎ দগ্ধীভূত হইয়া যাইবে, দেখিবে অচিরে ভারত-গগণে স্বাধীনতাসূর্য্য আবার উদিত হইয়া মৃদুমধুরহাস্যে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিবে।

ভাবিয়া দেখ যাহার জননী পরের আজ্ঞাকারিণী দাসী, তাহার ঘৃণিতজীবনধারণে কি সুখ! ভাবিয়া দেখ, পরের প্রসাদ-লাভেচ্ছায় যে নরাধম মহাবীর্য্যশালী, উদারচেতা ভ্রাতার বক্ষঃদেশে

ছুরিকাঘাত করিতে পারে তাহার পাপজীবন কত নীচতাপূর্ণ ও কত অশান্তিময়! ভাবিয়া দেখ, যে ক্ষুদ্রাশয় ভ্রাতৃরক্ত-পিপাসু শত্রুর সাহায্যকারী—সেই পাপাত্মা শৃগালকুক্কুর অপেক্ষাও কত অধম!

হায়! হায়। আমি উন্মত্তের ন্যায় কি বকিতেছি? কে মুসলমানের বিরুদ্ধে আজ আমায় সাহায্য করিবে? কে আজ আমার সহিত সম্মিলিত হইয়া অরাতিনিধনে ব্যগ্র হইবে? কে আজ দুঃখিনী ভারতজননীর অশ্রু মুছাইয়া দিবার জন্য আমাকে উৎসাহিত করিবে? না, কেহই করিবে না! কেহই আমার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবে না। তবে কি আমি, স্বীয় সুখলালসার বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষণবিধ্বংসী জীবনের মমতায় মুসল্‌মান্‌আততায়ীর সহিত সন্ধি স্থাপন করিব? তবে কি আমি অতি ঘৃণ্য কাপুরুষের ন্যায় জননীস্বরূপা জন্মভূমিকে পরের কিঙ্করী করিয়া দিব? না, তাহা কখনই হইবে না। ধমনীতে একবিন্দু রক্ত থাকিতে তাহা হইবে না। কেবলমাত্র স্বীয়-শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই অরাতিনিধনে তৎপর হইব। তাহাতে জীবন যায়, ক্ষতি নাই। দাসিপুত্রের জীবনে সুখ কি?”

মনে মনে এই রূপ স্থির করিয়া বীরবর হরিশ্চন্দ্র বঙ্গে মুসল্‌মান্‌ শক্তির ধ্বংস করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে দূত ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ শিবনারায়ণের নিকট প্রত্যাগত হইয়া হরিশ্চন্দ্রকথিত সমস্ত বিষয় যথাযথ বর্ণন করিল। শিব নারায়ণ মনে মনে বায়ড়াধিপের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে

পারিলেন না। কিন্তু বঙ্গেশ্বর জেলালুদ্দিনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রকে সাহায্য করিতে তাঁহার সাহস হইল না। যদিও তিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করিলেন না বটে তথাপি মনে মনে তিনি রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিজয়কামনা করিতে লাগিলেন।

বায়ড়াধিপতি সন্ধিপ্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে অবগত হইয়া মুসলমান্ সেনাপতি সেকন্দর বায়ড়া আক্রমণ করিবার জন্য সসৈন্যে বক্রপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রাজদ্রোহী অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাজার সর্ব্বনাশসাধনেচ্ছায় পথিমধ্যে সেকন্দরের সহিত মিলিত হইল। তাহারা মুসলমান্ সেনাপতিকে বুঝাইয়া দিল যে যদিও তাহারা বায়ড়ারাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ভাণ করিবে বটে কিন্তু গোপনে গোপনে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া তাঁহার ঔদ্ধত্যের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে যত্নবান হইবে।

সেনাপতি সেকন্দর খাঁ বায়ড়াবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট এই রূপ আশা পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে বায়ড়া অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মায়াপুর নামক গ্রামে উপস্থিত হইলে বীরবর হরিশ্চন্দ্র সসৈন্যে তাঁহার গতিরোধ করিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলমান সৈন্যগণ হিন্দু-সৈন্যের দ্বারা বেষ্টিত হইল। মায়াপুরের নিকটস্থ এক বিশাল প্রান্তরমধ্যে অরাতিসেনা দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া মুসলমানগণ

প্রমাদ গণিল। বাহির হইতে খাদ্য পাইবার আর কোনই আশা রহিল না।

এই রূপ ভাবে একপক্ষকাল থাকিলেই মুসলমানগণ ক্ষুধার তাড়নায় আত্মসমর্পণ করিবে—এই আশায় রাজা হরিশ্চন্দ্র মুসল্মানসৈন্য আক্রমণ করিলেন না। এদিকে মুসলমান-সেনাপতি রাজদ্রোহী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যে রাজার অজ্ঞাতসারে প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রায় এক মাসের উপযোগী খাদ্য সংগৃহীত হইলে সেকন্দর খাঁ স্বীয় সৈন্যগণকে হিন্দুসৈন্য আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। আদেশপ্রাপ্তিমাত্রেই মুসল্মান সৈন্যগণ ভীষণ হুঙ্কার করিয়া মহাবেগে হিন্দু-সৈন্যের উপর পতিত হইল। ঘোর সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর দেখা গেল মুসল্মানগণ স্থানে স্থানে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্দেশ আক্রমণ করিতেছে।

এই ব্যাপার দর্শন করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র এক দ্রুতগতি তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া স্বীয় সৈন্যশ্রেণী পরিদর্শন করিতে করিতে ধাবিত হইলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি দেখিতে পাইলেন রাজ্যের কতকগুলি প্রধান ব্যক্তির অবহেলায় ও উদাসীনতায় মুসল্মানগণ তাঁহার সৈন্যব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তখন তিনি অতি কাতরভাবে তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, "আমার আশা ছিল—আপনারা স্বীয় জন্মভূমিরক্ষার্থে প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন। কিন্তু এক্ষণে তাহার অন্যথাচরণ দেখিয়া বোধ হইতেছে—আপনারা আমার প্রতি শত্রুতাসাধনে কৃতনিশ্চয়

হইয়াছেন। কোন কোন সময় আপনাদের উপর আমি যে কঠোর ব্যবহার করিয়াছি তাহার প্রতিশোধ লইবার ইহাই কি উপযুক্ত সময়? এখন আমাদের দেশের শত্রু, আমাদের সকলের শত্রু, আমাদের ধন, মান, যশঃ—আমাদের সর্ব্বস্ব লইতে দ্বার দেশে উপস্থিত। এমন সময় তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়া স্বীয় গৃহদ্বার উদঘাটনে যত্নবান্ হওয়া কাপুরুষতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক্ষণে যুক্তকরে আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—আপনারা আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া দেশ শত্রুর ধ্বংসসাধনে যত্নবান হউন। আপনাদের বীরকীর্ত্তি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হউক। আপনাদের অক্ষয়যশঃসৌরভে পৃথিবী আমোদিত হউক।”

রাজার এই উৎসাহবাক্যে কোন ফলোদয় হইল না। মুসলমান সৈন্যগণ অতি অল্পকালের মধ্যেই হিন্দুসৈন্যগণকে পরিবেষ্টন করিয়া দুর্দ্দমনীয় তেজে যুদ্ধ করিতে লাগিল। হিন্দু-সৈন্যগণ আক্রমণবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়মানসৈন্যগণ শত্রুহস্তে নিহত হইতে লাগিল। হিন্দুসৈন্যমধ্যে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল।

এই বিপৎকালে মহাবল হরিশচন্দ্র পঞ্চশত বিশ্বস্ত বীর যোদ্ধার সহিত মুসলমান্ সেনাপতি সেকন্দরের দিকে ধাবিত হইলেন। রাজা অগণিত শত্রুসৈন্য নিহত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার ভীম পরাক্রম দর্শনে ভীত হইয়া মুসলমান বীরগণ তাঁহাদের সেনাপতির প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য সেই দিকে

ধাবিত হইল। নিমিষের মধ্যে পঞ্চশত হিন্দুবীর প্রায় দশ সহস্র মুসলমান সৈন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ হইল। রাজা আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া উন্মত্তভাবে অসিচালনা করিতে করিতে অরাতি নিধন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার পঞ্চশত বিশ্বস্ত বীর জন্মভূমির উদ্দেশে হৃদয়রুধির পাত করিয়া অমরনিকেতনে প্রবেশ করিল। রাজার বাহ্যজ্ঞান নাই। তিনি একাকীই এক্ষণে অসংখ্য শত্রুর সহিত মহারণে নিযুক্ত। মুসলমান সেনাপতি রাজাকে নিহত না করিয়া ধরিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু জীবন্ত সিংহকে ধরিতে কেহই সমর্থ হইল না। রাজা একাকীই সহস্র বীরের শক্তি ধারণ করিয়া শত শত যোদ্ধাকে ধরাশায়ী করিতে লাগিলেন। মুসলমানগণ তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। রাজা হরিশ্চন্দ্র সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। বঙ্গের গৌরবরবি-রাহুগ্রস্ত হইল। মুসলমানগণ বিজয়োল্লাসে 'খায়ড়ায়' প্রবেশ করিল।

উপসংহার।

রাজা হরিশ্চন্দ্র যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাজপরিবারস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা অতিত্বরান্বিত হইয়া গোপনে বায়ড়া রাজ্য হইতে প্রস্থান করিলেন। মুসলমানগণ সদলবলে শূন্য প্রাসাদে প্রবেশ কবিয়া যথেচ্ছ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। অতঃপর লুণ্ঠনকার্য্য সমাপ্ত হইলে রাজহর্ম্ম্য সম্যক-রূপে ধ্বংস করিয়া মুসলমানগণ রাজ্যমধ্যে নানা প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে বলদর্পিত মুসলমান সৈন্যেব অসিমুখে জীবন অর্পণ করিল—অনেকে প্রস্থান করিয়া জীবন ও সম্মান রক্ষা করিল—আবার অনেকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল মহম্মদীয় সৈন্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল।

এইরূপে বায়ড়া রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও শ্রীহীন করিয়া মুসলমান্ সেনা বিজয়োল্লাসে গৌড়াভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

কিছুকাল পরে রাজ্যমধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে রাজা হরিশ্চন্দ্রের তৃতীয় পুত্র প্রতাপ রায় এবং পঞ্চম পুত্র মুকুন্দরাম রায় হামিদবাটী গ্রামে এবং চতুর্থ পুত্র সন্তোষ রায় গোপীনাথপুর গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করিলেন।

প্রতাপ রায়ের পৌত্র জানকীরাম রায় মাধবপুরে বাস করেন। জানকীরাম রায়ের বংশে শান্তিরাম রায় জন্ম গ্রহণ করেন। এই শান্তিরাম রায় বর্দ্ধমানাধিপের একজন ইজারাদার হইয়াছিলেন। ইনি প্রচুর ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। ১১৭৬ সালের মন্বন্তর কালে শান্তিরাম রায় ধান্য বিক্রয় করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। এই অর্থে তিনি বহু কালেক্টরী মহল ও পত্তনী-মহল ক্রয় করিয়া একজন বিখ্যাত জমিদার হইয়া উঠেন। এই সময়ে ইঁহার বার্ষিক আয় প্রায় তিন চার লক্ষ টাকা হইয়াছিল।

শান্তিরাম রায় মাধবপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে অনেক গুলি দীর্ঘিকা খনন করান। তিনি আরও অনেক লোকহিত-কর কার্য্য করেন। তিনি অতিশয় অতিথিসৎকারপরায়ণ ছিলেন।

শান্তিরাম রায়ের প্রজাবাৎসল্যে বায়ড়া রাজ্যের কিয়দংশ আবার সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু হায়! এ সমৃদ্ধিও অধিক দিন স্থায়ী হইল না। সর্ব্বসংহারকারী কালের কুটিল গতি কে বুঝিতে সমর্থ হইবে?

যে বায়ড়া রাজ্য একদিন মহাবীর রণজিতের অসামান্য প্রতাপে দুঃখদৈন্যহীন হইয়া সুখনিকেতনে পরিণত হইয়াছিল, সেই বায়ড়া রাজ্য রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময়ে মুসলমানগণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইবার পরও রণজিতের উপযুক্ত বংশধর শান্তিরাম রায়ের মহাপ্রাণতায় আবার উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু বিধির রহস্যময় বিধানে আবার

উহা উন্নতির অর্দ্ধপথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অবনতির অতল তলে তলাইয়া পড়িল।

যে স্থানে মহাবীর রণজিতের সুগভীর পরিখাবেষ্টিত প্রাসাদ বর্ত্তমান ছিল এখনও তাহা 'গড় বাড়ী' নামে প্রসিদ্ধ আছে। এই গড়বাড়ীতে রাজা রণজিৎ রায়ের বংশে শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ রায় জন্মগ্রহণ করিয়া এক্ষণে হাওড়া নগরে ব্যবহারাজীবের কার্য্য করিতেছেন এবং মাধবপুরে বিপিন বিহারী রায় শান্তিরাম রায়ের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বংশের পুনরুন্নতি বিধানে যত্নবান হইয়াছেন। ভগবান্ বঙ্গবীর রণজিতের বংশধরগণকে বংশোচিতগুণগ্রামে বিভূষিত করুন।





'বঙ্গবীর রণজিৎ রায়' লেখকের প্রণীত 'বঙ্গবীরাঙ্গনা রায় বাঘিনী' সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন।

১। "বঙ্গবীরাঙ্গনা রায় বাঘিনী" সম্বন্ধে এসিয়াটীক সোসাইটীর সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌-এ, সি, আই, ই মহোদয়ের মন্তব্য।

শ্রীযুক্ত বাবু বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "রায় বাঘিনী" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। ইহাতে মোগল পাঠানের যুদ্ধের কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে ভুরস্থুটের ব্রাহ্মণরাজ-বংশের ইতিহাস লেখা হইয়াছে। ভূরস্থুট ও নিকটবর্ত্তী পরগণা সমূহে গ্রামে গ্রামে গিয়া এই ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। তাহাতে বিধুবাবু বেশ পরিশ্রম করিয়াছেন ও বেশ ইতিহাস নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। এই রাজবংশ প্রায় চারিশত বৎসর অপ্রতিহতপ্রভাবে দক্ষিণ রাঢ়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং অনেক কীর্ত্তিকলাপও রাখিয়া গিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বংশ ধ্বংস হইয়া যায় ও এই বংশের একজন বাঙ্গালার প্রধান

কবি হইয়া উঠেন। তিনিই আমাদের রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়। আকবরের সময় এই বংশের একজন রাণী, রাণীভবশঙ্করী উড়িষ্যায় পাঠানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাঢ় দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া বাদসাহ আকবর তাঁহাকে "রায় বাঘিনী" উপাধি দিয়াছিলেন। এখনও বাঙ্গালাদেশে পরাক্রমশালিনী রমণী হইলেই তাহাকে "রায় বাঘিনী" বলিয়া থাকে।

বিধু বাবুর এই উদ্যম অতিশয় প্রশংসনীয় কিন্তু তাঁহার উদ্যম যেন এই খানেই শেষ না হয়। ভুরশুট অতি প্রাচীন স্থান। ৯৯১ খৃষ্টাব্দে এই খানে বসিয়া কায়স্থ রাজা পাণ্ডুদাসের জন্য শ্রীধর বৈশেষিক দর্শনের প্রধান ভাষ্য পদার্থ-ধর্ম্ম-সংগ্রহের টীকা লিখিয়া বৌদ্ধগণকে পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন। ১০৯২ সালে কৃষ্ণ মিশ্র যে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক লেখেন তাহাতে ও ভুরশুটের ব্রাহ্মণগণের বিদ্যা বুদ্ধি ও জাত্যভিমানের অনেক কথার উল্লেখ আছে। ভুরশুট এককালে বাঙ্গালার নবদ্বীপ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে ৫৬ গ্রামীন্ বা গাঞী হয়, তখন ভুরশুটের নামেও একটী গাঞী হইয়াছিল। ভুরশুটের ব্রাহ্মণদিগকে ভুরিশ্রেষ্টিক বা ভুরিগাঞী বলিত। এই ভুরিগাঞী ব্রাহ্মণেরা এখনও ভুরশুট পরগণায় আছেন কি না জানিবার জন্য সকল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরই কৌতূহল আছে। বিধুবাবু যদি এ সকলেরও তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া দিতে পারেন, যথার্থ ইতিহাসের উপকার করা হয়।

ব [illegible] ইতিহাস হ[illegible] ও এসে বারেই [illegible] পাড়তে

নভেলের মত লাগে। আমি ত এক দমেই গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। মাঝখানে ছাড়িয়া দিতে কষ্ট হইয়াছিল। ভাষা অতি সুন্দর এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা গ্রামের, নানা দেব মন্দিরের, নানা যুদ্ধের কথা থাকায় পড়িতে অতিশয় মনোহর হইয়াছে। বিধুবাবু যে সকল প্রমাণ পাইয়াছেন, তাঁহাতে কালাপাহাড়কেও এই বংশের লোক বলিয়া মনে হয়। কালাপাহাড় বাঙ্গালায়, উড়িষ্যায় অনেক মন্দিরই ভাঙ্গিয়াছেন কিন্তু ভুরস্থটের একটীও ভাঙ্গেন নাই। ইহাতে তাঁহার কথা সত্য বলিয়াই মনে হয়। বইখানি খুব ভালই হইয়াছে। এখন বাঙ্গালার লোকে পড়িলে বিশেষ উপকার হইবে

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২। "বঙ্গবীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী" সম্বন্ধে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার অভিমত :—

It gives us very great pleasure to welcome the appearance of a historical romance in the true sense of the expression, which we have no doubt, will be regarded as an acquisition to Bengali Literature. The author has already made a name for himself by his researches into the history of the family and the times of the illustrious poet, Bharat Chandra Ray. He has presented the Bengali—

reading public with this fruit of his earnest and strenuous labours which depicts with considerable skill the warlike exploits of a Bengali heroine, Rani Bhabasankari of the historic Rai family of Garh Bhowanipur. It does one's heart good to read how in those brave days, a Bengali lady could lead troops and plan campaigns and demonstrate her courage and prowess. The Emperor Akbar honoured her with the title of "Rai Baghini" which she eminently deserved in recognition of her military achievements. The history of Kalapahar incorporated into the book will be read with great interest The account of his heroic deeds, his apostacy and his career as an iconoclast will rivet the attention of the reader. We get again a charming glimpse of the Porganah of Bhurshut and the victories of war and triumphs of peace standing to the credit of its princes. The author has done valuable service by bringing to light a forgotten page in the history of Bengal teeming with deeds of valour and heroism. He has drawn up with considerable care a genealogical table of the Rai family. The

printing, paper, pictures and binding are all that could be desired and the price is only one rupee and eight annas.

৩। "বঙ্গ বীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী" সম্বন্ধে হিতবাদীর মন্তব্য ঃ—

আমরা পুস্তক খানি পাঠ করিবার পূর্ব্বে উপন্যাস বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু পাঠ করিয়া সে ধারণা দূর হইল। এই পুস্তকে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাসের কিয়দংশ লিখিত হইয়াছে। যে প্রাচীন ব্রাহ্মণরাজবংশে মহাকবি ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভুরস্থট বা প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের সেই রাজবংশেরই একজন রাণীর বীরত্বকাহিনীঅবলম্বনে এই গ্রন্থখানি রচিত। রাজা রুদ্রনারায়ণের মহিষী রাণী ভবশঙ্করী সম্মুখযুদ্ধে পাঠান সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া তদানীন্তন দিল্লীর সম্রাট্ আকবরের নিকট হইতে "রায় বাঘিনী" উপাধি পাইয়াছিলেন। গ্রন্থকার প্রাচীন কাহিনী, কিংবদন্তী এবং ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তক খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। লেখার গুণে ইহা উপন্যাসের ন্যায় আনন্দদায়ক হইয়াছে। বর্ত্তমান হুগলী ও হাওড়া জেলার পশ্চিম অংশ এবং মেদনীপুর জেলার কিয়দংশ—অর্থাৎ দামোদর নদের সন্নিহিত বিস্তৃত ভূখণ্ডই পূর্ব্বে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য ছিল। ঐ প্রদেশের বহুগ্রামে এখনও প্রাচীনরাজগণের কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। আলোচ্য গ্রন্থে কয়েক খানি চিত্রে এই সকল কীর্ত্তি দেখান হইয়াছে।

৪। "বঙ্গবীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী" সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকার মন্তব্য।

"Banga Birangana Rai Baghini" by Babu Bidhu Bhushan Bhattacharji is a romantic account of a heroic Bengali lady of the Brahmin Raj family of Bhurshut. This princess Rani Bhabasankari defeated the rebellious Pathan leader Osman and saved the Southern part of Bengal from the Pathan depradations. For this heroism Akbar the Great, gave her the title of "Rai Baghini" which is even now used in Bengal with reference to daring women.

The book, though a history, is yet charming as a novel. There is nothing mythical in the account of the daring adventures of the chivalrous princess and the details are supported by apt evidences which the able author has taken great pains to gather.

On the whole the book is highly stimulating Reading both on account of the matter and the style. Bidhu Babu has done yeoman's service to the Bengali Leterature and the cause of history in thus saving from oblivion a highly interesting chapter in the history of Lower Bengal.

Though there are several glowing examples of the heroic ladies of Rajastan yet our hearts are filled with pride and enthusiasm when we read of the Bengali princess hunting on horse-back, issuing commands to her troops and actually fighting against and defeating a Pathan captain who was a great enemy of the Emperor Akbar. So we hope to see "Rai Baghini" to be one of the houshold books of Bengal.

"বঙ্গবীরাঙ্গনা রায় বাঘিনী" লেখক প্রণীত "অভিরাম গোস্বামী" যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এই পুস্তকে মধুর প্রেম-সাধনা অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ এতই মনোহর হইয়াছে যে ইহা পাঠ করিতে করিতে অতি বড় নাস্তিকের নীরস হৃদয়েও ভক্তিরসের সঞ্চার হইবে।